KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No KLMLGK 200'	Place of Publication : ৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কল ২৬
Collection KLMLGK	Publisher ~~ধীরা ভট্টাচার্য~~ Dhira Bhattacharya
Title অনুরাগ (ANURAAG)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 7 8 9 10	Year of Publication : Jan 1996 May 1996 Sep 1996 Jan 1997
	Condition : Brittle Good ✓
Editor ধীরা ভট্টাচার্য	Remarks

C.D. Roll No KLMLGK

কলকাতা বই মেলা

অনুরাগ

দশম সংকলন : মাঘ ১৪০৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ। সর্বাধ্যক্ষ ঃ শান্তি রায়
পৃষ্ঠপোষক ঃ দীপালী চৌধুরী, কমলপাণি রায়চৌধুরী, অপরেশ সেন

অনুরাগ

দশম সংকলন ঃ মাঘ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি ১৯৯৭

উপদেষ্টাঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য
সহযোগী ঃ জয়ন্তী সান্যাল, বিউটি মজুমদার, মীনা বসু, অর্চিতা রায়চৌধুরী
সাংগঠনিক প্রধান ঃ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন
৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগ

দশম সংকলন ঃ মাঘ ১৪০৩

জানুয়ারি ১৯৯৭ চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

রাগানুগ। খড়দহ ৩
মতামত। এ কে মিত্র, জয়ন্ত ঘোষ ৪
হলিউড বেদান্ত সোসাইটিতে। কৃষ্ণা রায় ৫
ডায়েরির পাতা থেকে। ধীরা ভট্টাচার্য ৮
অপেক্ষা করব। বীথিকা চন্দ্র ৯
যদি পালিট খায়। সত্য বসু ১৪
ফিরে আসা। শংকরনাথ ভট্টাচার্য ১৬
স্বপ্ন। হেমন্তকুমার অধিকারী ২২
স্বাধীন বঙ্গভূমি। দেবকুমার গুহ ৩০
প্রেমঘোরে প্রীতিঘোরে। বিপ্লব রায় ৩০
বিশ্বদর্শন। সিস্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১
জীবন। মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ৩২
একটু তখন কাঁদবে। হরিভট্ট ৩৩
মুক্তি। শরৎ সাউ ৩৪
বিসর্জন। লতিকা দাশগুপ্ত ৩৫
অন্ধকারের অনুভব। বিউটি মজুমদার ৩৫
চাঁদডুবি। শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ৩৬
সূর্যাস্তে সেই গান। শংকর আচার্য ৩৭
সবার উপরে স্বার্থ সত্য। নিতাইচন্দ্র দত্ত ৩৮
একটা ছেলে। শোভন বিশ্বাস ৩৮
মহানদের দান। শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯
শতবর্ষে নেতাজী। প্রতিভা ভট্টাচার্য ৪০
বই ও পত্রপত্রিকা। কৃষ্ণস্বামী ৪২
আদিত্যকুমার-স্মরণমঙ্গল। শিখা গোস্বামী ৪৩
আরো মতামত। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮

সত্য প্রেস, ১০/২ প্যারীমোহন সুর লেন কলি-৬ থেকে মুদ্রিত।
পাঁচ টাকা।

খড়দহ

খড়দহ নাম শুনলেই মনে হয় হাজার বছর আগে এখানে ধানগাছে ধানের ফলনের চাইতে খড়ই বেশি পাওয়া যেত, তাই হয়তো স্থানটির নাম হয়েছে খড়দহ। কিন্তু আজ চারশো বছর যাবৎ খড়দহ একটি বৈষ্ণবতীর্থ। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে শ্রীনিত্যানন্দ বসুধা-জাহ্নবা দুই বোনকে বিয়ে করে এখানেই সংসার পাতেন। নিত্যানন্দ-সেবিত বিগ্রহ শ্যাম রায় এখনো প্রতিদিন অসংখ্য ভক্তকে আকর্ষণ করে চলেছেন।

এই খড়দহের কুলীনপাড়াতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পদধূলি-ধন্য 'ভুবন ভবনে' গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ ফণীন্দ্র সাংস্কৃতিক পরিষদের ষষ্ঠবার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল সাড়ম্বরে। প্রথম দিনে শঙ্খধ্বনি, বেদ-উপনিষদ সঙ্গীত, মঙ্গলাচরণ, দেশরাগের মূল সুরে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত—ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সভাপতি ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত। স্বাগত ভাষণে অশোককৃষ্ণ দত্ত। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ডাঃ রামকৃষ্ণ ঘোষ মণ্ডলের নাম উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ গুণীজন সম্বর্ধনা। এবারে সম্বর্ধিত হয়েছেন ভেষজ প্রতিষ্ঠানের স্বনামধন্য ডাঃ জি. পি. সরকার, শিল্পী কবি ভোলানাথ মজুমদার, নাট্যশিল্পী অহীন মুখোপাধ্যায় এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ও অনুরাগের উপদেষ্টা প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার দীর্ঘকালের সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে এই পরিষদ্। ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা ডি. এল. রায়। এই বছর নেতাজীর জন্মশতবর্ষ। ১৯৯৬-৯৭তে এক বছর ধরে শতবার্ষিক উৎসব হচ্ছে। ডি, এল, রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়ের শতবার্ষিকীও চলছে এই সময়েই। ফণীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীও এই বছর। প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পিতৃদেব

তথা গুরুদেব অন্তরালের সাধক-কবি আদিত্যকুমারের শতবর্ষ-উৎসবও হয়ে গেল সম্প্রতি। সবই কেমন কাকতালীয়! দিলীপকুমার রায় ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন হরিহরাত্মা-বন্ধু। দিলীপ রায় নেতাজীর চেয়ে এক দিনের বড়।

পরিষদের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল—আকাশবাণী প্রাত্যহিকীর লেখক-শ্রোতাদের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন। বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিবৃন্দের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও পাঠের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যৌবনের পদধ্বনি অনুভব করা গেছে।···এই অঞ্চলের ডাকঘরের নামটিও বড় সুন্দর। বলরাম ধর্মসোপান। এই নামটিও আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

আমরা ফণীন্দ্র সাংস্কৃতিক পরিষদকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

মতামত

শারদীয় 'অনুরাগ' সত্যই অনবদ্য। প্রবন্ধ গল্প কবিতা প্রত্যেকটি হৃদয় স্পর্শ করে। বিশেষত কবিতার মধ্যে দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিভট্ট, মৃণাল ঘোষ, শান্তনু খাটুয়া, দীপালী চৌধুরীর ভ্রমণ, জয়ন্তী সান্যালের প্রবন্ধ, ধীরা ভট্টাচার্যের অনুবাদ, সুধা চট্টোপাধ্যায়, বীথিকা চন্দ্র ও দীপক গুপ্তের গল্প আমার কাছে বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। সম্পাদকীয় 'অর্থই পরমার্থ' খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। সম্পাদককে ধন্যবাদ। শারদীয় 'অনুরাগ' অপূর্ব, অপূর্ব। একান্ত হৃদয়গ্রাহী ও অনবদ্য।

—এ, কে, মিত্র, কলিকাতা-৩৩

'অনুরাগ' হাতে এল। খুব ভাল লেগেছে। সুন্দর লেখাগুলো পড়ে পরিচয় হল 'অনুরাগের' সঙ্গে। শুভ কামনা রইল।

—জয়ন্ত ঘোষ, ঝুমরিতেলাইয়া, বিহার

হালউড বেদান্ত সোসাইটিতে কৃষ্ণা রায়

সুদূর পরবাসে বসে বাংলাদেশের পূজা পার্বণের কথা মনে পড়া বাঙালীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বারমাসে তের পার্বণের দেশ বাংলা। বাংলায় জন্ম ও জীবন-এর বেশীকিছুটা সময় কাটানোর ফলে বাংলার পূজোর অনুষ্ঠানগুলো আমাদের মনে পড়ে বার বার। যারা পূজোর অনুষ্ঠানের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাদের মনে পড়া আরো স্বাভাবিক। ব্যক্তিগতভাবে এত দূর থেকে হাজির হতে না পারলেও মনে মনে চলে যেতে বাধা নেই সেই পূজোর আনন্দঘন দিনগুলোর স্মৃতি মন্থনে।

প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে উত্তর আমেরিকার লস-এঞ্জেলস শহরে প্রবাসী হিসাবে বহু বছর বাস করে ঘরের পূজা, দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজো, ভাইফোঁটার মত বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোর থেকে প্রায় প্রতি বছরই বাদ পড়ি। বিদেশে বাস করে বিদেশী সংস্কৃতি জানার যেমন সুবিধে আছে অপরদিকে নিজেদের দেশ ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বাদ পড়ার মত বেদনাও আছে। বিদেশে বসে মনে মনে ভাবি পূজো এসে গেল। সারাদেশ জুড়ে সাজ সাজ রব। আজ মহালয়ার দিন। দেবীপক্ষের প্রথম প্রভাতে "বীরেন্দ্র কিশোর ভদ্র" মহালয়ার চণ্ডীপাঠ ঘরে ঘরেই দুর্গা-পূজো আগমনী ও বন্দনা গীতিতে ভরে দেয়। জাগো দুর্গা জাগো দশ-প্রহরণধারিণী বলে। তখন মন কলকাতার ঘর পানে ছুটে চলে যায়। শরতের আকাশ, হাওয়ায় দোলা লাগা কাশ ফুলের মাথা, শিউলি ফুলে মাঠ ছেয়ে যাওয়ার দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হই। এরপর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার চারদিনের অনুষ্ঠান তো আছেই।

দুর্গাপূজার পরে লক্ষ্মীপূজা তারপরে পনের দিনের মাথায় শ্রীশ্রীশ্যামা মায়ের পূজা। অমাবস্যার নিশিভোর মায়ের পূজো। বাজীর গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বাজীর আওয়াজ ও আলোর

রোশনাই-এ কালীপূজোর ঘটা প্রকাশ পায়। ঢাক ঢোলের সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে পূজো ও আরতি হয়। সারা রাত কলকাতা জেগে কাটায় মায়ের পূজোর আনন্দে মেতে। মাইলের দূরত্ব যতই হোক মন চলে যায় কলকাতার আলো-ঝলমলে দেউলে।

লস-এঞ্জেলস শহরে হলিউডে "বেদান্ত সোসাইটী" বেলুড় মঠের শাখা। স্বামী স্বাহানন্দজী মহারাজ এখানকার অধ্যক্ষ। স্বামী সর্বদেবানন্দজী সহ-অধ্যক্ষ। এঁদের তত্ত্বাবধানে বেদান্ত সোসাইটী পরিচালিত হয়। মন্দির সহ দুইটী আবাস ও একটি কনভেণ্ট, সন্ন্যাসিনীরা ও ব্রহ্মচারিণীরা থাকেন। মন্দির সংলগ্ন গৃহে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বাসস্থান। এই মন্দিরেই হলিউড বেদান্ত সোসাইটীর নিত্যপূজা, পাঠ, গীতা, উপনিষদ, কথামৃত ব্যাখ্যা চলে প্রতিদিনই। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের পূজো বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। বেদান্ত সোসাইটীর শ্যামাপূজা এক বিশেষ অনুষ্ঠান। বাঙালী এসোসিয়েসনের পরিচালনায় দুটী দুর্গাপূজা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র হলিউডের বেদান্ত সোসাইটী ছাড়া কোথাও কালীপূজা হয় না। প্রতি বছর স্বামীজীদের তত্ত্বাবধানে সোসাইটীর শ্যামাপূজা সম্পন্ন হয়। বেলুড় মঠের প্রথা অনুযায়ী বিদেশী ভক্তদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই পূজা সম্পন্ন হয়।

মায়ের মৃন্ময় মূর্তি তৈরী করেন বিদেশিনী ভক্তেরা। দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মূর্তির অনুকরণে মূর্তি তৈরী হয়। দীর্ঘ এলোকেশী মূর্তির পদতলে মহাকাল। পুরো মূর্তিটি একটি বিরাট নীলপদ্মের ওপর স্থাপন করা হয়। মন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও ঈশার চিত্র। সিংহাসনে নানা দেবদেবীর মূর্তি। পাদদেশে ঠাকুর ও মায়ের দুই মহান যোগী পুত্র স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজীর চিত্র সজ্জিত আছে। একাসনে ঠাকুর ও ঈশার পূজো দেখে মন আনন্দে ভরে যায়।

এই মন্দির-গর্ভের পার্শ্বদেশে মা জগতজননীর মূর্তি রাখা হয়।

চারদিক নানা বর্ণের পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত করা হয়। মন্দিরের ভূমিতলে শুভ্রচাদর পাতা হয় তার উপর অতি মসৃন কাঠের পাটাতন পাতা হয়, তার ওপর ত্রিপায়ায় তাম্রকুণ্ড রাখা হয় ও এই পাত্রে পূজোর উপকরণ নিবেদিত হয়। পূজোর আগে পূজোর ব্যবহৃত সমস্ত বাসন, পঞ্চপ্রদীপ, কোশাকুশি ইত্যাদি ঝকঝকে করে পরিস্কার করা হয়। পূজোর দিন সন্ন্যাসিনী ও সহযোগীদের গভীর নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে মন্দির এক পবিত্র পূজো অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। মায়ের কণ্ঠে নানা বর্ণের পুষ্পমালা, সারা অঙ্গে দিব্য অলংকারে কালো মেয়ের রূপের ছটায় ভুবন আলোকিত করে।

রাত দশটায় শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পূজোর শুভ সূচনা ঘোষিত হয়। বার্কলে সেণ্টারের স্বামী অপরানন্দজী মহারাজ পুরোহিতের আসন অলংকৃত করেন। পাশে তন্ত্রধারক পোর্টল্যাণ্ডের স্বামী শান্তরূপানন্দজী। তিনদিক ঘিরে স্বামী স্বাহানন্দজী মহারাজ, স্বামী সর্বদেবানন্দজী মহারাজ ও আমেরিকান সন্ন্যাসীরা। পূজো-মণ্ডপে মায়ের সন্ন্যাস পুত্রদের একত্র সমাবেশ ও সুমিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। ভারতীয় সাধুদের মন্ত্র-পাঠের সংগে একজন বিদেশী সন্ন্যাসীর স্পষ্ট, শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ ও নিষ্ঠার সঙ্গে পূজো করা দেখে মন পরম তৃপ্তিতে ভরে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীশ্যামা মায়ের পূজো একের পর এক করা হয়। পূজোর ফাঁকে ফাঁকে মন্দিরে চণ্ডীপাঠ ও শ্যামাসঙ্গীত গীত হয়, এই পরিবেশ মনে ভক্তিভাব আরও গভীর করে তোলে। আমরা সবাই মাঝে মাঝে আখরে সেই অনুষ্ঠানকে পূর্ণ করে তুলি। এ পূজা এক কথায় অবর্ণনীয়।

হোম শেষে পূজা সমাপন হয়। এবার বিসর্জনের পালা। বিসর্জনের শেষ শান্তিবারি দেওয়া হয়। এরপর ভোগ বিতরণ হয়। পরবর্তী শনিবারে একটি বড় নৌকায় দেশী বিদেশী সকল ভক্ত মিলে প্রশান্ত মহাসাগরে মায়ের মূর্তি বিসর্জন দিতে যাই। এ এক মনোজ্ঞ দৃশ্য। শ্যামাসঙ্গীত গীত হয়, ও ধীরে ধীরে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি

বিসর্জিত হয়। মাকে নিবেদিত সকল দ্রব্য প্রসাদ হিসাবে সকলকে বিতরণ করা হয়। পরে মিষ্টিমুখ হয়। ওঁশান্তি, ওঁশান্তি, ওঁশান্তি।

ডায়েরীর পাতা থেকে ধীরা ভট্টাচার্য

গতকাল সামনের বাড়ীর আটত্রিশ বছরের বিলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। রেখে গেছে বিধবা মা, ছোট ভাই, বোন, স্ত্রী ও দুটী ছোট ছেলেমেয়ে। গিয়েছিলাম বিলের মাকে সহানুভূতি জানাতে। মরচে পড়া গাড়ীর চাকা তেলের অভাবে যেমন চলার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে, তেমনি বিলের মা ঘুমের মধ্যেই বিলে বিলে করে এক নাগাড়ে কাতরে যাচ্ছিলেন। সহানুভূতি জানান হলো না, ভারী মনে ফিরে এলাম।

আজ মাধুরী এসেছিল। ও শুধু নামেই মাধুরী নয় চেহারায় ওর মাধুর্য ঝরে পড়ছে। ওকে দেখলে বড় কষ্ট হয়। বিয়ের দুবছর পরে ওর একটি ছেলে হয়। সে জন্ম-মুহূর্তে মারা যায়। শোকার্ত হৃদয়ে ব্যথা-ভার বহন করে তিন বছর পরে একটি অপরূপা সুন্দরী মেয়ে হয়। কিন্তু বিধাতার কি নিঠুর পরিহাস, এর দুবছর পরে ওর স্বামী মারা যায়। আজ ওর মেয়ে ছাব্বিশ বছরের, নিজে ও আমেরিকা আর ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছে শান্তির আশায়। ভগবান ওর মনে শান্তি দিন।

আজ বিদেশ থেকে ললিতার বর দীপক এসেছে, চার বছর আগে ওকে বিয়ে করে, একটি কন্যারত্নের পিতা হয়ে দীপক বিদেশে পাড়ি দেয়। তারপর থেকে কোন খোঁজ নেই। আজ হঠাৎ ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে বলল ললিতাকে সে নিয়ে যাবে আমেরিকায় তার কর্ম-ক্ষেত্রে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। জল না পাওয়া শীর্ণ গাছের মত ললিতা আজ বর্ষার নদীর মত আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর ললিতাকে চিরসুখী করুন।

অপেক্ষা করব বীথিকা চন্দ্র

—এই তোমার রাজ্যপাট, এই তোমার নিভৃত···কথাটা অসমাপ্ত রেখেই আলো জেবলে হাসি মুখে তাকায় ইন্দ্র তৃণার দিকে। নিওনের আলোয় ঐশ্বর্য আর সুরুচি নিয়ে ঝলমলিয়ে ওঠে ঘর, সারা ঘরে ভাসছে বিলিতি পারফিউমের সাথে রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধ, রজনীগন্ধা আর রক্তগোলাপ দিয়ে সাজান ঘর। আজই তাদের বাসর, আজই তাদের ফুলশয্যা। কিছুক্ষণ আগে তারই ছাড়পত্র নিয়ে এসেছে তারা রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে। এত ঐশ্বর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে তৃণার। বিয়ে, বাসর, ফুলশয্যা। এই শব্দগুলিই যেন বিড়ম্বনা বয়ে এনেছে।

—কি মহারাণীর পছন্দ হয়েছে? ইন্দ্র তার হাতটা ধরে ভিতরে একটা সোফায় এনে বসায়।

—সাব্, কফি দেব? পর্দা সরিয়ে একটা কালো মুখ উঁকি মারে।

—হ্যাঁ দুটো কফি দে। আর কিটটু কি করছে? ওর খাওয়া হয়েছে?

—একটু আগে ঘুমালো। হ্যাঁ খেয়েছে। শুধু একটু স্যুপ।

—কি করিস তোরা? এই সারা রাত একটু স্যুপ খেয়ে থাকবে? ইন্দ্র অসহায়ের মত তৃণার দিকে তাকাতেই, তৃণা ওর হাতের ওপর হাতটা রেখে বলে—তুমি আর ভেবো না, কাল থেকে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

—পারবে? পারবে তো তৃণা? আমার কিটটুকে বুকে টেনে নিতে? আমি একা একা আর পারছিনা পারছিনা। ইন্দ্র তার দুহাতের ভিতর মুখটা গুঁজে দেয়, সন্ধ্যে থেকে দেখা আভিজাত্য, শিক্ষা আর ঐশ্বর্যের অহংকারে অহঙ্কারী সেই ইন্দ্রকে এখন খুঁজে না পেয়ে বুকের ভিতর যেন একটু স্বস্তি বোধ করে তৃণা। তাই খুব

অন্তরঙ্গ সুরে বলে—আর তো তুমি একা নও ইন্দ্র। চল ছেলেটাকে একটু দেখে আসি।

—যাবে? এক্ষুণি যাবে? খুশী হয় ইন্দ্র।

—বা রে তাহলে আবার কখন? চল, বলে উঠে দাঁড়ায় তৃণা। বুকের ওপর ছবির বইখানা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে কিটটু, কি অসহায় করুণ মুখখানা। ইন্দ্র ছেলের পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সারা ঘর জুড়ে খেলনা আর বই, ঘরের কোণে বিরাট মাছের এ্যাকুরিয়াম। দরজার বাইরে দাঁড়ে দুলছে কাকাতুয়া, ছোট্ট দোলনায় ঘুমচ্ছে, সাদা ধবধবে একটা কুকুর-বাচ্চা, মানুষের ঘরে বিভিন্ন জীব জন্তুর বাহার। একটু অবাক হলেও কারণটা বোঝে তৃণা। ঐ অসহায় ছ-বছরের পঙ্গু শিশুটার সাথী এরা, এদের দিয়েই বোধহয় মায়ের সাহচার্য্যর অভাবটা মেটাতে চেয়েছে ইন্দ্র। দেওয়ালে টাঙান সুন্দরী মহিলার ছবির দিকে চোখ পড়তেই, তৃণা বোঝে এই কিটুর মা, সুধাকণ্ঠি আজকের নামকরা শিল্পী পাপিয়া। ছবি থেকে চোখটা সরাতেই ইন্দ্রর সাথে চোখাচোখি হয় তৃণার। একটু কৈফিয়তের সুরেই ইন্দ্র বলে—ওর এই রূপ, এই গ্ল্যামারই কাল হলো, যশ আর খ্যাতির মোহে এই অসহায় ছেলেটাকে ফেলে চলে গেল। তৃণা নীচু হয়ে ঘুমন্ত ছেলেকে একটু আদর করে বলে—চল, ওকে ঘুমতে দাও, কিন্তু ঘুম আসেনা ওদের কারও চোখে। শুধু একটা চিন্তাই মনের মাঝে পাক খেতে থাকে। আজ থেকে তৃণা তার পদবী ব্যবহার করবে। তার বাড়ীতে থাকবে, এক বিছানায় শোবে, হয়ত প্রয়োজনের তাগিদে তারা কাছেও আসবে। কিন্তু তার সব চেয়ে বড় পরিচয় সে কিটুর মা হবে। আর সেই জন্যই তাকে আনা, তাই আবার বিয়ে নামক প্রহসনটা মেনে নেওয়া। তা-নাহলে, ইন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী হবার যোগ্যতা তৃণার নেই, সে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, মধ্যবিত্ত পরিবারের বৌ। আজ সে বিধবা নিঃসন্তান। শিক্ষা মধ্যম। দেখতেও তাই। আর মানসিকতাও ঠিক সেরকমই। যেমন মায়া মমতা দায়-দায়িত্ব থাকে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বৌ দের।

এরাই পারফেক্ট মা; ধৈর্য, সহ্য, আত্মত্যাগ ওদের প্রতিটি রক্ত কণিকায় আর ঠিক এমনটিই চেয়েছিল সে। স্ত্রী চাইনি, শয্যা সঙ্গিনীরও তার অভাব নেই, সে শুধু চেয়েছিল কিটুর একটা মমতাময়ী মা। যা সে টাকা দিয়ে কিনতে পারত না, আর পারত না বলেই এই মধ্য বয়সে···নিজের ভাবনাটা সরিয়ে রেখে এবার তৃণার দিকে তাকায় ইন্দ্র। মাঝখানে দুটো পাশবালিশ রেখে ওপাশে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে তৃণা স্বপ্ননীল আলোর বন্যায় তাকে দেখতে মন্দ লাগেনা। ইন্দ্র জানে তৃণা ঘুমোয়নি, ঘুমতে পারেনা। বাঙালী ঘরের বিধবা তার মজ্জায় মজ্জায় সংস্কার জড়িয়ে আছে। অবস্থার বিপাক আবার বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। শুধু তার নিজের নিরাপত্তার জন্য, তাই এর কাছে কৃতজ্ঞতা, মমতা আর কর্তব্য ছাড়া প্রেম আশা করা যায় না, দেহের উষ্ণতা তো নয়ই। তবু মেয়েটাকে দুই একবার দেখে খারাপ লাগেনি তার, বেশ সহজ সপ্রতিভ আলগা ন্যাকামো নেই, যা উচ্চবিত্ত সমাজে দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত। তৃণা এ পাশে মুখ করে থাকলেও বুঝতে পারে, মানুষটা জেগে। দুটো পাশ বালিশের ব্যারিকেড যে কত পলকা সেটা ভেবে, প্রতিমুহূর্তে একটা আশঙ্কা জাগছে মনে, এই বয়সে ভাবা যায়না অন্য একটা পুরুষের সান্নিধ্য, কাগজে দুটো সই করে কি জীবনটা এমনভাবে পাল্টানো যায়? আইন-আদালতের থেকেও যে বড় সংস্কার যা তার ধমনিতে বইছে তাকে কি অস্বীকার করা সহজ? শালগ্রামশীলা অগ্নিসাক্ষী, মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সাতপাকে বাঁধার ওজন যে বড্ড ভারী; অস্বীকার করব, ভুলে যাব বল্লেই তো এর শেষ হয়না। সেই মানুষটাই হয়ত নেই। কিন্তু এসব স্মৃতি যে শত সহস্র পাকে জড়িয়ে ধরেছে। তৃণার চোখ দুটো জলে ভরে আসে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মালা চন্দন পরা একখানা মুখে, সহসা দুকান ভরে বেজে ওঠে—এই একবার তাকাও আমার দিকে।' তাদের বাসর রাত্রি প্রথম কথা ছিল এটাই।

—এস আজ রাতটা গল্প করে কাটিয়ে দিই, ঘুম বোধহয় আজ আমাদের দয়া করবেনা, আচমকা ইন্দ্রর কথাগুলো কানে যেতেই,

তৃণার বুকের ভিতর শির শির করে ওঠে, সে নিজের মনেই বলে ওঠে, কিন্তু তুমি আমাকে দয়া কর ইন্দ্র, অন্তত আজকের রাতটা। তৃণা চট করে গায়ের কাপড় ঠিক করে বিছানার ওপর উঠে বসে বলে—রাত এখন কত? তার চোখে-মুখে যেন আতঙ্ক ফুটে ওঠে।

—ইন্দ্র ওর চোখে চোখ রেখে বলে—শেষ হতে কিছু বাকি।

—নতুন জায়গা তো তাই ঠিক ঘুম আসছিলো না। সহজ হতে চায় তৃণা।

—বাড়ীর জন্য মন কেমন করছিলো?

—বড্ড ভাবনা হয়, বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর যে আমি ছাড়া কেউ নেই। তবু ওরা জোর করে আমায়—কথাটা অসমাপ্ত রেখে মাথা নীচু করে তৃণা, কান্নায় বুকটা ভারী হয়ে ওঠে।

—সত্যি বলতে কী, কাগজে অমন বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়তেই বেশ কৌতূহল নিয়েই তোমাকে দেখত গিয়েছিলাম, বাবা মা বিধবা কন্যার জন্য হামেশাই বিজ্ঞাপনে পাত্র চান, কিন্তু শ্বশুরমশাই তার বিধবা পুত্রবধূর জন্য পাত্র চাইছেন, এটা একটা দৃষ্টান্ত, ঠিক তখনই আমি ডিসিসান নিলাম, আমি বিয়ে করব।

—কারণ তোমারও দরকার একটা মা'য়ের। কিট্টুর মা, তৃণা ইন্দ্রর চোখে চোখ রাখে। কথাটা নগ্ন সত্য, তবু এমন আচমকা তৃণার মুখ দিয়ে সোজাসুজি শুনে একটু চমকে ওঠে ইন্দ্র। তৃণার চোখের ভাষাটা বোঝার চেষ্টা করতে করতে বলে—ঠিক বলেছ, ঐ অসহায় ছেলেটার জন্য, আমার স্বস্তি নেই। শান্তি নেই। জন্ম থেকে ছেলেটার পোলিও। সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও, ও যদি সুস্থ হত তো, স্কুল বোর্ডিং-এ রাখার ব্যবস্থা করতাম, প্রতিটি মুহূর্তে ছেলেটা আশা করে ওর মা আসবে, ওকে কোলে নিয়ে আদর করবে, ওকে গল্প বলবে, ইন্দ্রর চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়ে।

—ওর কি মা'র কথা মনে আছে?

—না, ওর যখন দুবছর তখনই তো সে চলে গেল। একবারও সে ভাবলো না ছেলেটার কি হবে। আজ সে চিত্রজগতের নামি দামী

স্টার, থাক তার কথা। তুমি শুধু বল তৃণা। কিট্টু কি কাল থেকে তার মা খুঁজে পাবে? ইন্দ্র আকুল হয়ে তৃণার হাত দুটো চেপে ধরে।

—কেন পাবে না। নিশ্চয় পাবে।

—সত্যি বলছ? আনন্দে আবেগে ইন্দ্র হাত মাড়িয়ে সুইচটা জেলে দিতেই আলোর বন্যায় তৃণার মুখের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত চুপ হয়ে যায় সে।

—কি হল? অবাক হয় তৃণা, ইন্দ্র ব্যস্ত পায়ে ততক্ষণ ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে রুপর সিন্দুর কৌটটা নিয়ে আসে, দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও খেয়াল ছিলোনা তৃণার সিঁথিটা শূন্যই রয়ে গেছে।

—তৃণার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে, তার ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায় ইন্দ্র,। গভীর নীরবতায় শুধু দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রেজেষ্ট্রি করার চেয়ে, সিন্দুর পরা বা পরানো যে এত কঠিন, সে কথা এর আগে একবারও মনে হয়নি। তৃণার বুকের ভিতর চাপ চাপ ব্যথা, অতীতের সেই ছবিটা কাঁপছে তার চোখের সামনে—সিন্দুরকুনকে দিয়ে সিন্দুর পরিয়ে দিচ্ছে একজন, ছবিটা ঝাপসা হয়ে যায় চোখের জলে, ইন্দ্র স্থির নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তৃণার কষ্টটা বোঝার চেষ্টা করে। জলে ভেজা মুখটি তুলে তাকায় তৃণা। তার দুচোখে নীরব আকুতি।

—ইন্দ্র ওর হাতখানা তৃণার মাথায় রেখে বলে—থাক্ তৃণা, আমি অপেক্ষা করব, বলে সিন্দুর কৌটটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। রাতের আঁধার ফিকে হয়ে আসছে, শেষরাতের ঠাণ্ডা বাতাস তার চোখে মুখে যেন পরশ বুলিয়ে যায়, ইন্দ্রর মনে হয় কিট্টু হয়ত তার মা'কে খুঁজে পাবে। কিন্তু তৃণা কি সত্যিই কোন দিন তার স্ত্রী হয়ে উঠবে না? যেটা তার প্রত্যাশা ছিলো না, আচমকা সেখানেই যেন একটু ব্যথা টের পায় ইন্দ্র, এ ব্যথা নিঃসঙ্গতার ব্যথা।

যদি পাল্টি খায় সত্য বসু

সমর, সুর্মাকে বিয়ে করার জন্যে জীবনপণ করেছে।

ছেলের ভাবগতিক দেখে সমরের বাবা বিমান বিলক্ষণ বিরক্ত। পাশের বাড়ির এই মেয়েকে ছোটবেলা থেকে দেখছেন। মেয়েটি রূপসী, উচ্চশিক্ষিতা, স্বভাবচরিত্রে কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু ছেলের বউ করার মত, বিমান যেমন চান, সুর্মার আচরণবিধিতে সে-রকম কোন দৃঢ়তা বা গভীরতা নেই। যেন ভাসমান পানা। ছড়িয়ে-জড়িয়ে বেশ বড় জটলা, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে স্রোতের টানে এদিক ওদিক চলে যেতে পারে।

প্রতিবেশী বড়লোকের একমাত্র সন্তান সুর্মা স্রেফ বাপ-মার অতিরিক্ত আদরে, অদূরদর্শিতায় পরিণত যৌবনেও মানসিকভাবে শিশুর মত অপরিণত রয়ে গেল। মেয়েটা, বিমান কথা বলে দেখেছেন, এখন অতিরিক্ত ন্যাকা, দারুণ রকম ইম্‌প্র্যাকটিক্যাল আর ভীষণ ইমাজিনেটিভ। এমন একজন স্বপ্নবিলাসিনীকে শো-কেসে সাজিয়ে রাখা যায়, বিয়ে করে সংসার করার চেষ্টা বাতুলতা। কিন্তু সমরকে একথা বোঝাবে, এখনও তার জন্ম হয়নি। মা মারা যাওয়ার পর থেকে ছেলে ক্রমশ বেয়াড়া, গোঁয়ার আর বদরাগী হয়ে পড়েছে। নিজের কোন সিদ্ধান্ত থেকে ওকে নড়ানো অসম্ভব।

বিমান সুর্মার অভিভাবকদেরও ঘাঁটাতে চান না। ওতে কোন লাভ নেই। ওরা সমরকে জামাই করার জন্যে হাত ধুয়ে বসে আছে। সুর্মার পছন্দ, ব্যস আর কোন কথা নেই। আদুরে মেয়ের জন্য এমনই একবগ্গা মানসিকতা।

বিমানের দিনগুলো এ-ভাবেই কাটছে। ভারী মন নিয়ে চলাফেরা। যবে থেকে ছেলের অভিপ্রায় জেনেছেন—জীবন সাহারা। এবং বুকে ওজন নিরেই প্রাত্যহিকতা, আহার-নিদ্রা-অফিস, বিমান চালিয়ে যাচ্ছেন, যেমন অধিকাংশ মানুষ চালিয়ে থাকে।

ওরই মধ্যে বিমানের আজকের দিনটা একটু অন্যরকম হল। অফিসে পৌঁছে, ডিপার্টমেণ্টাল ট্রান্সফার—বিমানের পছন্দের পারচেজে—চিঠিটা হাতে পেয়ে, মন তাৎক্ষণিক আবেগে ভারমুক্ত হল। অনেক তদারকির পর বাঞ্ছিত জায়গায় যেতে পারল বিমান।

পারচেজে যাওয়া মানে, ওদের প্রতিষ্ঠানে, প্রায় প্রতিদিন নোটের আমদানি। মাইনেতে হাতই পড়ে না। বিমান ভাবলেন, অবশ্যই বাবা তারকনাথের দয়ায় এমনটি সম্ভব হল। বিমান সপরিবারে ভোলেবাবার ভক্ত।

ইচ্ছা পূরণ হলে চুলদাড়ি ফেলে পুজো—মানত করা ছিল। তারকেশ্বরে গিয়ে মাথা মোড়ালেন বিমান। সমরও বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

বিমান জানতেন ছেলে তাই করবে। গোঁয়ারগোবিন্দ সমরের ধর্মাচারণে কোন ফাঁকি নেই। উল্টে এসবে প্রবল আগ্রহ।

পুজোটুজো দেওয়া হল। মাথা মুড়োনো সারা। বাপ-ছেলের হাতে প্রসাদী ফুল, পেড়া ইত্যাদি—দু'জনে স্টুডিওয় ঢুকলো ছবি তুলতে। তারকেশ্বরে এমন রেওয়াজ আছে। মস্তকমুণ্ডনের পর ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায়।

দুটো বাপ-ছেলের একসঙ্গে, কিন্তু বেশ কয়েকটা সমরের সিঙ্গল স্ল্যাপ। সমরের আপত্তি কানে তুললেন না বিমান। বললেন, তোকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে রে সমর। মাথা কামানো, গোঁফ নেই—এক্কেবারে অন্যরকম। এই চেহারাটা যদি না ধরে রাখি···। সেবারে তোর মা চলে যেতে, ঘাট কামানোর পরে···তা তখন তো আমাদের দু'জনেরই···

সমর বলল, এ আবার হয় নাকি! তুমি বলছ কী। আমি তো জানি নেড়া মাথায়, গোঁফ কামিয়ে আমায় বিচ্ছিরি দেখায়। সেবারে মা'র কাজের পর সবাই বলেছিল।

বিমান হাসলেন। বললেন, কী জানি। আমার তো ভালই লাগে। সেবার লেগেছিল; এবার আরো সুন্দর লাগছে। একটুও

বাড়িয়ে বলছি না, মনে হচ্ছে যেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সামনে দাঁড়িয়ে।

বিমান ডাহা মিথ্যে বললেন। উনিও জানেন সমরকে এই অবস্থায় বেশ খারাপ দেখায়। রীতিমত কদর্য। মুখটা অবিকল মর্কট-সুলভ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে শরীরের ভেতরে অস্বস্তি হয়।

তবে এটাই এখন প্লাস পয়েণ্ট। সমরের এই রূপকে নিয়ে বাজি খেললেন বিমান। পরিকল্পনা ছকলেন।

সমরের প্রতিটা ছবির এনলার্জ কপি সুর্মাকে পাঠানো হবে। সমরের এই কদাকার চেহারা মেয়েটার সুকুমার মনে অবশ্যই একটা বড় ধাক্কা দেবে। এবং যেহেতু মেয়েটা ভীষণ ভাবপ্রবণ—এই ধাক্কা সামলাতে না পেরে ওকে রিজেক্ট করে দেবে।

হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সুর্মা অতিরিক্ত ইমাজিনেটিভ বলেই এমন স্বপ্ন দেখা।

যদি তা না হয়, যদি সুর্মাকে বিয়েই করতে হয়, তবে সমরের ম্যারেড লাইফ, ফ্রায়েড লাইফ হচ্ছেই।

তবে, বিমানের লাস্ট হোপ, এবারও বাবা কৃপা করবেন। তারকনাথের দয়ায় সুর্মা পাল্টি খাবে। বিয়ে কেঁচে যাবে।

ফিরে আসা

শংকরনাথ ভট্টাচার্য

খাটের উপর আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে আছে সমীরণ। তার সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে সারা গায়ে কেউ যেন হুল ফোটাচ্ছে আর তার বিষে সমস্ত শরীর ঝটকা মারছে। মাথায় সাতটা স্টিচ। পায়ের গোড়ালীতে প্রচণ্ড ব্যথা। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে শুয়ে আছে অথচ তার সময়ের কোন খেয়াল নেই। হঠাৎ সে অনুভব করলো যে তার বাথরুমে যাবার দরকার। ধীরে ধীরে উঠতে গিয়ে সে অনুভব করলো যে তার শিরদাঁড়া সোজা করে রাখবার ক্ষমতা

নেই। অনেকটা অসহায়ের মতই সে তার মাকে ডাকলো, মায়ের সাহায্যে অতিকষ্টে সে খাট থেকে নামতে পারলো, কিন্তু এক পা চলার শক্তি তার নেই। কোনক্রমে সে দাঁড়িয়ে একটু শান্তি পেল। মা তাকে শুইয়ে দিয়ে তার জন্য হরলিকস আনতে গেলেন। সমীরণ শুয়ে শুয়ে তার দুরবস্থার কথা ভাবছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও সে সুস্থ সবল ছিল। কেন তার উপর এমন বজ্রপাত হল। একটা মাত্র পেনালটি কিক্ করার জন্য ভগবান তাকে এমন সাজা দিলেন? সে তার আত্ম-সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ফিরে গেল তার ছেলেবেলার দিনগুলিতে যখন সে সমীরণ ব্যানার্জী ছিলনা, ছিল সবার একান্ত আপনার সমীর।

কলকাতার কাছেই এক বর্ধিষ্ণু অঞ্চল বারুইপুর। তার কাছেই এক অখ্যাত গ্রাম প্রাণবল্লভপুরে সমীর তার বাবা, মা, বোন এবং ভাইকে নিয়ে থাকতো। সমীরের বাবা সরকারি চাকুরি করেন, তাতে ভালভাবেই চলে যায়। প্রাণবল্লভপুরের একমাত্র গর্ব হল 'নেতাজী সুভাষ সঙ্ঘ' এবং তাদের বিশাল খেলার মাঠ। নেতাজী সুভাষ সঙ্ঘের বহু খেলোয়াড় কলকাতা প্রথম ডিভিসন লীগে বিভিন্ন দলে খেলে থাকে। ফুটবল খেলাটাকে সমীর প্রাণের চাইতে বেশি ভালবাসত। পড়াশুনো বাদ দিয়ে সে সকাল-সন্ধ্যা ফুটবল নিয়েই থাকতো। তার বাবা তাকে উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন বড় হতে গেলে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। বড় হয়ে সমীর নেতাজী সুভাষ সঙ্ঘে সেণ্টার ফরোয়ার্ড পজিসনে খেলার সুযোগ পেল। তার কোচ মণ্টুদা তাকে খুব ভালবাসত। তিনি সব সময়ে বলতেন, তুমি 'সেণ্টার ফরোয়ার্ড", তোমার কাজই গোল করে যাওয়া। কখনও প্র্যাকটিসে ফাঁকি দেবেনা। বিপক্ষ খেলোয়াড়দের সম্মান দিলে দেখবে তারাও তোমাকে সম্মান দেবে। গোলের সামনে বল পেলে পৃথিবীর সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে তোমার একমাত্র কাজ হবে গোল করা, তাতে যদি তোমার কোন ক্ষতি হয় তো হোক। নেতাজী সুভাষ সঙ্ঘে খেললেও সমীর সব সময়ে স্বপ্ন দেখতো অনেক বড় ফুটবলার

হওয়ার। কলকাতায় নামী-দামী ক্লাবে খেলার। কোচ মণ্টুদা সেই সুযোগ করে দিল। তখন তার বয়স ১৯ বছর। যেদিন প্রথম তার লীগের খেলা পড়ল, সেই দিনেই তার বাবার হার্ট অ্যাটাক হল। বাবাকে হাসপাতালে দিয়ে সে খেলার মাঠে পৌঁছাল। দেরি করে আসার জন্য মণ্টুদা তাকে অনেক বকলেন। এবং বাবার অসুখের দোহাই দিয়েও সে খেলার থেকে ছাড় পেল না। সেদিন সে দুর্দান্ত খেললো, একাই তিনটে গোল দিয়ে বিপক্ষকে কাবু করে দিল। খেলা শেষে হাসপাতালে গিয়ে শুনলো তার বাবা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো ১৯ বছরের সমীরের উপর। সংসারের চাপ যত বাড়ছিল ততই সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞচিত্তে খেলায় উন্নতি করছিল। এইভাবে লীগের খেলা শেষ হবার পর দেখা গেল, সমীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। মাঠের সবাই বিস্মিত হতেন যে, রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে কিভাবে এত ভাল খেলতে পারে। প্রথম বছরেই সমীরের এই অসাধারণ সাফল্যের পর প্রাণবল্লভপুরে সে একজন গন্যমান্য লোক হয়ে উঠলো। গর্বে বুক ফুলে উঠতো তার মা-বাবার। কিন্তু তারা তখনও ভাবতে পারেননি তাদের জন্য আরও অনেক চমক আছে। একদিন কলকাতার এক নামী ক্লাবের দুই কর্মকর্তা সমীরকে তাদের দলের হয়ে খেলার জন্য নিতে এলেন। তাঁরা সমীরকে ৪০ হাজার টাকা দেবে এবং ভাল খেলতে পারলে আরও টাকা পাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানালেন। অভাবের সংসারে এই প্রস্তাব ভগবানের আশীর্বাদের মত মনে হলো। তাঁরা কথা দিলেন সমীর খেলবে। প্রথম বছরে সমীর জুনিয়ার প্লেয়ার হওয়াতে বেশি সুযোগ না পেলেও বছরের শেষের দিকে সে দলের অপরিহার্য্য খেলোয়াড় হয়ে উঠলো। পরের বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হল তাদের দল। সমীর তখন তাদের দলের নয়নের মনি হয়ে উঠলো। কেননা হায়েস্ট স্কোরটা সমীরেরই ছিল।

এর মধ্যে সমীরের অনেক পরিবর্তন এসেছে। সমীর থেকে

হয়েছে সমীরণ ব্যানার্জী। প্রাণবল্লভপুর থেকে সে উঠে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার ফ্লাটে। তার মা-বাবা পৈতৃক ভিটে ছেড়ে আসতে রাজি হননি। তাই সমীরণ মাসে মাসে কিছু করে টাকা পাঠিয়ে তার বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। সে এখন এক সফল মানুষ। তাই সে তার অতীতকে ভুলতে চায়। ভুলতে চায় সে এক গ্রামের ছেলে। পরের বছর দলের অত্যন্ত দুরবস্থা। টাকা নেই—ক্লাবের ফান্ডে। কর্মকর্তাদের অনুরোধে অনেক নামী খেলোয়াড় নামমাত্র টাকায় সেবার ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য রাজী হয়েছে। ব্যতিক্রম কেবল সমীরণ ব্যানার্জী। সে জানে তার এখন বাজারদর অনেক। ইচ্ছে করলেই সে মোটা টাকা আদায় করতে পারে। পল্টুদার অনুরোধ সত্বেও তাকে তিনলাখ টাকার কমে রাজী করানো গেল না। ক্লাব তাকে টাকা দিতে বাধ্য কারণ সমীরণ ছাড়া টিম মানেই হার। কিন্তু এই বৈষম্যের ফলে দলের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। অন্য খেলোয়াড়রা তাদের সেরা খেলা দিতনা।

কারণ তারা বলতো, ফুটবল এগার জনের খেলা, কিন্তু এই টিমের প্লেয়ার তো ঐ একমাত্র সমীরণ ব্যানার্জী। দলের ফল খারাপ হতে লাগলো। লীগে তারা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হল। কর্মকর্তা, কোচ সকলেই সমীরণকে দুষতে লাগলো। সমর্থকরা বিরক্ত হতে লাগলো সমীরণের উপর। এরই চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটলো আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনালে। এক গোলে হারছিল তাদের দল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তারা একটা পেনাল্টি পেল। গোল করার জন্য এগিয়ে এল সমীরণ। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে সমীরণের শট বার উঁচিয়ে চলে গেল এবং সাথে সাথেই রেফারীর খেলা শেষের বাঁশী দিল আবার পরাজিত কারণ সেই একমাত্র সমীরণ ব্যানার্জী। জনতার রোষ পড়ল তার উপর। সমীরণের মনে আছে সে ক্লাবের পিছনের দরজা দিয়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু সে জানতো না ওখানেও ওরা দাঁড়িয়েছিল। সমীরণের শুধু মনে আছে যে কারা যেন পিছন থেকে তার মাথায় রড দিয়ে মারতে মারতে বলছিল, 'শেষ করে দে

শালাকে, একেবারে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দে।

আই-এফ-এ শীল্ডের পর প্রায় পনের দিন হয়ে গেছে, কিন্তু ক্লাবের কোন কর্তা সমীরণের কাছে একবার অন্ততঃ আসার প্রয়োজন অনুভব করেননি। সমীরণ এখন দাঁড়াতে পারছে বা অল্প অল্প হাঁটাচলা করতে পারছে। ফুটবল খেলার কথা তো স্বপ্নের বাইরে ডাক্তার বলেছে অন্তত ৪/৫ মাস কোনরকম ছোটাছুটি বা ভারী জিনিষ তোলা যাবে না। দেখতে দেখতে ডুরাণ্ড কাপ, রোভার্স কাপ, ডি, সি-এম, ট্রাফি শেষ হয়ে গেল। সেখানে সমীরণ না থাকা সত্বেও দলের ফল ভাল হলো না। সমীরণ ভাবল এইবার ক্লাব কর্তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই তাকে ডাকতে আসবে। কিন্তু সে বোধহয় জানতো না ল্যাংড়া, খোড়ার কোন মূল্যই নেই। দল বদলের সময় এগিয়ে এল। সমীরণ এখন পুরোপুরি না হলেও ৯০ ভাগ সুস্থ, অথচ তার কাছে ক্লাবের কোন অফার না আসায় সে বাধ্য হয়ে একদিন ক্লাবের তাঁবুতে হাজির হল। তখন ক্লাবকর্তাদের মিটিং চলছিল ক্লাবের টিম তৈরীর ব্যাপারে। সমীরণকে সেখানে আসতে দেখে সবাই অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। এক কর্মকর্তা তো বলেই দিলেন, তোকে আর আমাদের দরকার নেই রে, আমরা সামনের বছর ৩০ লাখ টাকার টিম গড়ব সে টিমে তোর মত বোকার কোন স্থান নেই। রাগে তার কান লাল হয়ে এল, সে মাথা নীচু করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। সমীরণ ভাবছিল কোথায় যাবে। এই সময় কেই বা তাকে সাহায্য করবে? অনেক রাত্রে সে বাড়ী ফিরলো এবং কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ল। রাত্রে তার ঘুম এল না। বারবার ঐ অপমানের কথা তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সকালে তার ঘুম ভাঙ্গলো মায়ের ডাকে। চোখ খুলে দেখলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত পি, কে, ব্যানার্জী এবং তাঁর সাথে আরো ২/১ জন ক্লাবের কর্মকর্তা। পি, কে, বললেন, দেখ এবার আমি অন্য দলের কোচ। আমি তোমাকে আমাদের টিমে চাই। তুমি অন্য ক্লাবের ছেলে বলে তোমাকে আগে কখনও অফার করিনি, কিন্তু গত সন্ধ্যার ঘটনা

শোনার পর আমরা তোমাকে নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি আমাদের নিরাশ করো না। সমীরণের কথা যেন বন্ধ হয়ে গেল এবং আনন্দ অশ্রু চেপে রাখতে পারলো না। পি, কে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন।

সমীরণ যেন আবার হাতে স্বর্গ পেল। কিন্তু পি, কে-র ট্রেনিং নিতে গিয়ে সে বুঝল যে তার আগের জায়গায় ফিরতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু সে হাল ছাড়ল না। তাকে সর্বদা সাহস দিতেন কোচ পি, কে, অধিনায়ক গৌতম, সুরজিৎ, সুব্রতর মত ষ্টার প্লেয়াররা। যদিও দুবছরের মধ্যেই সমীরণও ষ্টার হয়ে গিয়েছিল। সিজনের প্রথম দিকে তাকে কোচ সুযোগই দিলেন না। সিজনের মাঝপথে আই-এফ, এ, শীল্ডের খেলা। কোয়ার্টার ফাইনালের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় পি, কে, সমীরণকে নামালেন খেলা শেষ হবার ২০ মিনিট আগে। সমীরণ তেমন কিছুই করতে পারলো না। যদিও অপর দল ২—০ গোলে ম্যাচ জিতল। শনিবার বড় ম্যাচ। আই, এফ, এ শীল্ডের ফাইনাল। এই ফাইনালেই গতবার পেনাল্টি মিস করার জন্য সমীরণ ব্যানার্জীর জীবন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজ আবার সেই মুহূর্ত। শুধু তফাৎ গতবারে সে ছিল সারির মধ্যমণি। আর এবারে সে অন্য দলের সাইড লাইনে বসে আছে। খেলা শুরু হল, দুপক্ষই ছেড়ে দিতে রাজী নয়। দেখতে দেখতে বিরতির বাঁশী বাজলো। বিরতির পর খেলা আবার শুরু। খুব চেপে ধরেছে আবার দল। ওদের ফরোয়ার্ডদের দাঁত যেন তাদের ডিফেন্সের টুঁটি কামড়ে ধরেছে। হঠাৎ পি, কে উঠে দাঁড়ালেন, এবং সমীরণকে বললেন, তৈরী হবার জন্য। মাঠে নামবার আগে পি, কে তার হাত ধরে বললেন, বাবা আমার সম্মান আজ তোর হাতে। উভয় দলের দর্শকদের বিদ্রূপের মাঝে মাঠে নামলো সমীরণ। টি.ভ, রেডিওর ভাষ্যকারেরা পি, কে-র সিদ্ধান্তের উপর উল্টো মন্তব্য করলেন। সমীরণ জানে তার হাতে বেশী সময় নেই। যা করবার আজকেই করতে হবে। নয়তো আর কোনদিন পারবে না। খেলার

তখন আর মাত্র ৫ মিনিট বাকি। হঠাৎ সেণ্টার লাইনের কাছে একটা বল পেল সমীরণ। বলটা ধরেই দেখল সুরজিত ডান দিকে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে। সুরজিতকে বলটা ঠেলেই সে বিপক্ষ গোলের দিকে ছুটতে লাগলো। সবাই বলতো তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নাকি অত্যন্ত প্রখর তাই সে এত গোল পায়। হয়তো এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল সুরজিত একেবারে সাইড লাইন থেকে নিখুঁত সেণ্টার রেখেছে টপ বক্সের মাথায়। হঠাৎ তার মনে হল মণ্টুদার কথা। গোলের সামনে বল পেলে তুমি পৃথিবীকে ভুলে যাবে। অবিশ্বাস্য ভাবে লাফালো সমীরণ এক সঙ্গে অনেকগুলো আঘাত খেলো। গোলকিপার ভাস্করের ঘুষি, ডিফেন্সার মনিদার কনুই এবং চামড়ার বলের ঘা, তার কপালের মাঝখানে লাগলো। মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারাবার আগে সে দেখলো বল অপরদলের জালে। যখন তার জ্ঞান ফিরলো তখন সে নায়ক। তার দলের তাঁবুতে সবার মধ্যমণি হয়ে আছে। পি-কে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সবার অভিনন্দনের পর সমীরণ বাড়ী ফিরলো অনেক রাতে। দেখলো মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই তার পথ চেয়ে বসে আছে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, বাবার পা দুটো জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

স্বপ্ন হেমন্তকুমার অধিকারী

পাঁচটা বাজে। গগনচুম্বি গীর্জার ওয়াল-ঘড়ি হতে ঢং-ঢং শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক ঘণ্টা ঠাঁই বসে আছে সুষমা। জয়ন্ত বলেছিল—ঠিক চারটের সময় আসবে। সে এমনিই। কথার ঠিক নেই। চুলোর ঠিক নেই। একটা প্রাণী নির্জনে তার মুখ চেয়ে বসে আছে। তিনি হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। গল্প পেলে উঠতে চায় না। সময় জ্ঞান নেই। এক কথায় আজ তাকে 'ফাজিল' মনে হল। সুষমার ক্রোধ তার ঊর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে গেছে! আসুক সে আজ।

একটু কড়াকিয়ে দেব। পাঁচ-দশ মিনিট দেরী হতেই পারে, তাই বলে এক-দেড় ঘণ্টা নির্জন কাননে চুপটি করে বসে থাকা যায়! রাগে সুষমা ফুঁসছে। দাঁত কড়মড় করছে। চিবুনোর জিনিস হলে যেন চিবিয়ে খেত। রাগে-দুঃখ-অভিমানে সুষমা ক্রন্দনরত প্রায়।

ঠিক তাই। সুষমা যা ভেবেছিল ঠিক তাই। জয়ন্ত আসছিল ঠিক সময়েই। পথে দেখা বিপিনের সঙ্গে। কতদিন দেখা নেই। ছোট-বেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে, কখন যে দেড়ঘণ্টা সময় চলে গেল, সে বুঝতেই পারেনি। ঘড়ির দিকে চোখ ফিরতেই দেখল—সাড়ে পাঁ-চ-টা। এই রে···। বিপিন, আজ আসি ভাই। অনেক দেরী হয়ে গেল। জরুরী কাজ আছে।

বিপিন জয়ন্তর বন্ধু। একসাথে কত খেলা করেছে। স্কুলে গিয়েছে। একসঙ্গে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়েছে। উভয়ে, উভয়ের মনের সুখ-দুঃখ; কত গল্পচ্ছলে ব্যক্ত করেছে। এহেন জীবনসাথীর সঙ্গে বহুদিন পর দেখা হলে, একটু দেরী তো হবেই। কিন্তু সুষমা, সে তো তা বুঝবে না। বুঝবেই বা কি করে। সে তো জানে না। রাগ। সে তো হতেই পারে। যার ওপর অনুরাগ আছে, তার ওপর রাগ তো হতেই পারে। যে চারটেয় কথা দিয়ে, সাড়ে পাঁচটায় আসে, তার ওপর রাগ হবে না। এ কি একদিন! এ তো নিত্যনৈমিত্ত ব্যাপার! একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রতিদিন! আজ অমুক অসুবিধা, কাল তমুক অসুবিধা। অসুবিধা-অসুবিধা শুধুই অসুবিধা। সুবিধা নেই, শুধুই অসুবিধা। ঝগড়া। ঝগড়া করে না সুষমা। সুষমা রাগও করে না। সুষমা কাঁদেও না, হাসেও না। অভিমান। হ্যাঁ অভিমান করে। আজও সে তাই করেছিল। যেমনটি সে করে। মুখ নীচু করে বসে আছে। মুখ বিপরীত দিকে করে বসে আছে। এক পলকে তাকিয়ে আছে। ইঁটের মত, গাছের মত। অট্টালিকার মত।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করে—সুষমা, তুমি কখন এলে? উত্তর নেই। প্রশ্নও নেই। মনে হয় সুষমাও নেই!

—রাস্তায় কি বিভ্রাটেই না পড়েছিলাম। একে বিপিনের সঙ্গে দেখা। যদিও বা তাড়াতাড়ি আসছিলাম। আবার ফুটুস্! মানে 'বাষ্ট্'! সাইকেলেই 'বাষ্ট্'। না-না, টায়ার বাষ্ট্'। চল্ কেষ্টার দোকানে। কেষ্টা তো শেষটাই পটি লাগিয়ে দিল। পাম্প দিলাম। দেরী হয়ে গেল। আরে বাব্বা! তুমি তো দেখছি, মুখখানা বাংলা পাঁচের মত করে বসে আছ! তা, ওহে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, তোমার এহেন অবস্থার কারণ, কি প্রকারে এ অধম জ্ঞাত হবে! হে রাধে, তোমার মানভঞ্জন করতে, আমাকে কি কৃষ্ণ সাজতে হবে? সদ্য প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় তোমার বদনখানি; মলিন হয়েছে দেখে, আমার অন্তঃকরণ যে ভারাক্রান্ত হল। না-না, তোমার এ রূপ আমার দর্শনেন্দ্রিয় সহ্য করতে পারছে না। হে 'দ্বিভূজে', তুমি কি আমাকে নিধন করবার নিমিত্ত, 'দশভূজা' রূপে অবতীর্ণ হলে? অজ্ঞাতসারে কোনও ব্যক্তি যদি পাপকর্ম করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে কি পাপী বলা চলে? হে 'ধর্মাবতার' এ দাসের পাপকর্ম ব্যক্ত করে যথাবিধি দণ্ড বিধান করুন!

নিরুত্তর। কোনও উত্তর নেই। মৌনব্রতে রত। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। কাঠের পুতুল। মোমের পুতুল। পাথরের পুতুল। আত্মা নেই। পাখি নেই। খাঁচা আছে। প্রতিমা। মাটির প্রতিমা। তাকিয়ে আছে। এক পলকে। নড়ছে না, দুলছে না। কথা বলছে না। পুরোহিত বক্‌বক্ করছে—ওঠো—জাগো দেখা দাও। কথা কও। মাটির প্রতিমা। মাটির! রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে তৈরী নয়। মাটির তৈরী। ভিতরে পার্স নেই। পোয়াল। ধানের পোয়াল। দাঁড় দিয়ে বাঁধা। উপরে মাটি রঙ। কথা বলবে কি করে। রাগ হয়েছে। হবেই তো। দশটার সময় পুজো করার কথা। এখন দুটো! সে তো নেই। খাঁচা আছে। জড় পদার্থ। পূজা করবে না তো, প্রতিষ্ঠা করলে কেন? প্রতিষ্ঠা করলে তো, পূজা করলে না কেন? ভালোবাস? ভালোবাস তো বুঝলে না কেন? নিঃসঙ্গতার জ্বালা। হা-পিত্যেশ করার জ্বালা। চেয়ে থাকার জ্বালা, দুর্ভাবনার জ্বালা। মনের জ্বালা,

না-দেখার জ্বালা। সর্বোপরি এখন দেখার জ্বালা!

—বলল না। একটিও না। কোনও মতেই কথা বলল না। লোকে বলে, মেয়েছেলে ষোল কলা জানে। ষোলকলা? মাত্র। আমরা, অর্থাৎ পুরুষেরা জানি আঠারো কলা।

—তোমার দোষ নেই। আমারও নেই। দোষ আমার অদৃষ্টের। চাই একটু শান্তি, পাই অশান্তি। চাই আনন্দ, পাই নিরানন্দ। চাই ভালোবাসা, পাই কই? নেই! কোথাও নেই! হারিয়ে গেছে। পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! সব জায়গাটা দখল করেছে ঘৃণা। কোথায় থাকবে সে? ভালোবাসা? আমি ছিলাম, আমি আছি। হয়তো থাকব। ছিলাম নিঃসঙ্গ, ফাঁকা। মন আমার বন্ধু। কত কথা বলে। কত গল্প করে। ভয় দেখায়, সাহস দেয়। সঙ্গ দিলে তুমি। পাশে দাঁড়ালে। ভুবন-ভোলানী ভাষা দিয়ে প্রাণ জুড়ালে। কত দিলে, হাসলে। কেন সঙ্গ দিলে? কেন এসে পাশে দাঁড়ালে। হাসলেই বা কেন? কাঁদাচ্ছই বা কেন? নিঃসঙ্গতায় বেশ তো কালাতিপাত করছিলেম্। মনের সংগোপনে চোখের জলে বুকের ব্যথা ধুচ্ছিলাম। কেন তুমি আমার দুঃখানলকে, নিজ নয়নাশ্রু দিয়ে নির্বাপিত করেছিলে? অভিনয় করেছিলে? অভিনয়!

মা নেই! বাবাও নেই। থেকেও নেই। কেউ নেই। আমি আছি। আর তুমি বলেছিলে, আমার তুমি আছ। তোমার আমি আছি। দিলাম। তোমাকে সব দিলাম। তুমিও নিলে, আমাকেও দিলে। এখন কি আবার ফেরৎ দিচ্ছ! যেচে নিলে, যেচে দিচ্ছ! তোমার জন্যই ছিলাম, তুমি চলে যাচ্ছ, আমিও চলে যাব। আমি যাব ঐ উপরে। 'আয়নোস্ফিয়ারে', তুমি অত দূরে যেতেই পারবে না।

আমি খড়-কুটো নই যে, দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তোমার কাছে এখন অবাঞ্ছিত আমি। অবাঞ্ছিতই যদি হই, এ প্রাণ আর ধারণ করবো না। তুমি নতুন স্বপ্ন দেখছ। দেখ। তোমার নতুন চিত্তশীল ভুবনে কালো কালবৈশাখীর মেঘ হয়ে ভাসবো না। তোমার স্বাধীন চলার পথে কণ্টক হয়ে, তোমার যাত্রার ব্যাঘাত ঘটাবো না। চললাম।

সুখী হও। তুমি সুখী। আমিও সুখী। দুখী তো দুখী।

আত্মহত্যা? নরকে গমন। নরক? এর থেকেও নরক নিকৃষ্ট জায়গা! কত জায়গায় গিয়েছি। দিল্লী গিয়েছি, লন্ডন গিয়েছি, কলকাতায় গিয়েছি, সিনেমা দেখতে গিয়েছি। মারপিট, খুনোখুনি, কুরুচি-নাচ দেখেছি। চুরি করেছি, মন চুরি। মানুষ, মানুষকে খুন করে তাও দেখেছি। ভালোবাসে তাও দেখেছি, ঘৃণা করে তাও দেখেছি। নরকও দেখব, নরকেও যাব।

কোমরে গামছাটা শক্ত করে বেঁধে নিই, কাপড় পরে আছি। পায়ে যদি বেধে যাই, তাহলে পাথরের উপর পড়ব। খুব লাগবে। মরে যাব, ও মরতেই তো এসেছি। ঝাঁপ দেব, ভেসে যাব, নদীর জলের স্রোতে।

ভুল, কার ভুল? আমার! সুষমার? হ্যাঁ সুষমার। বিপিন, সে আমার বন্ধু, দেখা হলে কথা না বলে আসা ভুল নয়? দেরী হয়েছে, হতেই পারে। একটু দেরী হলই বা। যাকে ভালোবাসি, তার একটু অসুবিধা নিজে বরণ করে নেব না? কেমন ভালোবাস তুমি?

চোর। সে বলে আমি সাধু। দু-একটা বই পড়ে কেউ কেউ ভাবে নিজেকে পণ্ডিত। স্বীকার করে না নিজেদের অজ্ঞতা-অক্ষমতা। আমি স্বীকার করছি, ভুল আমারই হয়েছে। তবুও রাগ, নিকুচি করি। দিই এবার ঝাঁপ। কে? সুষমা? ধরলে কেন? কাদছ? কেন? উঃ কী গরম, স্নান করব, ঠাণ্ডা হব।

—কি করছ তুমি?

—স্নান করব। করিনি।

—ঠাট্টা কোরো না।

—বয়ে গেছে।

—রাগ করলে? তুমি আমাকে ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি তুমি কি জানো না, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। তুমি কি মানো না আমি তোমার, শুধু তোমার। তুমি কি বোঝ না হৃদয়ের ব্যথা। আমি না হয় ক্ষণেকের জন্য অন্যায় করেছি, তাই বলে তুমি আমাকে এত বড়

কঠিন সাজা দিতে চলেছ কেন? মাতৃ-পিতৃহীন ভুবনে, আমি যে বড় নিঃসঙ্গ। তুমিই আমাকে একদিন, নিঃসঙ্গতার গভীর কূপ হতে মুক্ত করেছিল। পুনঃ তুমিই আমাকে, আমার সদ্য আলোকিত ভূ-মণ্ডলে কেন অন্ধকে আহ্বান করছো? আমি তোমাকে ভালোবাসি। তাই তো তোমার, এখানে আসার বিলম্ব হেতু অভিমান করেছিলাম। তোমার ওপর আমার কি কোনও অধিকার নেই? যদি থাকে, সেই অধিকার বশে একটু অভিমান করা কি অন্যায়? তুমিই না বলেছিলে, সুখে-দুখে, বিপদে-আপদে, তুমি আমার কাছে থাকবে। যা আমার, তাই তোমার, যা তোমার তাই আমার। তুমিই না বলেছিলে, ত্রি-ভুবনে এমন কোনও শক্তি নেই, যে তোমাকে আমার কাছ থেকে ভিন্ন করতে পারবে! তুমিই, হ্যাঁ এই তুমিই, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য পাহাড়-পর্বত-ঝরণাকে সাক্ষী রেখে, আমার গলে বনমালা পরিধান-পূর্বক তোমার পত্নীত্বে আমাকে বরণ করেছিলে। বলো, বলো তুমি কি তা অস্বীকার করতে চাও? জন্মাবধি চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে আমি বড় হয়েছি। আমাকে যে কেউ ভালোবাসতে পারে, তা আমার কাছে ছিল স্বপ্নাতীত। কেন? বলো কেন তুমি আমার অন্তঃকরণকে বিচলিত করে তুলেছিলে, তোমার তীক্ষ্ণ ভালোবাসার শরে? এই আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—আঃ—আঃ—আঃ—

সুষমা···সুষমা··সু···ষ···মা! তোমার কি হল? একি তুমি হঠাৎ এমন নিস্তব্ধ হলে কেন? তবে কি! না, না-না! এ হতে পারেনা। হে ঈশ্বর, তুমি কি আমার হৃদয়নিধিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাও? আমার মনের নব-দিবাকর উদিত হয়ে, অসময়ে গমনোন্মুখ কেন? সুষমা—সুষমা, চাও। চেয়ে দেখ।

কাঁদছে। মন কাঁদছে। প্রাণ কাঁদছে। চোখ কাঁদছে। ভালোবাসা কাঁদছে। জয়ন্ত কাঁদছে।

সুষমা, আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। আমি কি তোমার ওপর রাগ করতে পারি? অভিমান করতে পারি? দিবাকর ভিন্ন, দিবার কি কোনও প্রতিকৃতি থাকে? অম্বর ভিন্ন, অম্বু কি কখনও

বিচরণ করতে পারে? সুষমা একটিবার কথা কও। একটিবার তোমার মুদিত নয়ন-যুগল উন্মোচিত কর। সুষমা—সুষমা।

জল পড়ছে। মেঘ হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে। তবে আকাশে নয়, মনে। জল পড়ছে। চোখ দিয়ে। ঝাপসা। অস্পষ্ট। জল পড়ছে। চোখের জল। ব্যথার জল। দুঃখের জল। ভালবাসার জল। কাঁদছে। জয়ন্ত কাঁদছে। খুব কাঁদছে। ডাকছে সুষমাকে।

কে? জয়ন্ত? তুমি কাঁদছ? কেন? কাঁদছ কেন? আমার তো কিছু হরনি! এই তো আমি তোমার কাছেই আছি। জড়িয়ে আছি। তোমাকে। ভালবাসাকে।

ভুল। অঙ্কে ভুল। নিজেদের জানা'কে ভুল। শুধুই ভুল। আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি। খু-উ-ব। আমাদের এই অ-কৃত্রিম ভালোবাসা দেখে, পক্ষীকুলও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছে। ঐ দেখ। দেখতে পাচ্ছ? পাচ্ছ না? আমি দেখতে পাচ্ছি। সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দুজনের হৃদয়ের এই মহামিলন দেখে, আকাশ, বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র, উদ্ভিদ মণ্ডলী, পক্ষীকুল, আমাদের জয়গান গাইছে। প্রেমের জয়গান গাইছে। নদী তার কুলুধ্বনি দ্বারা উলুধ্বনি দিচ্ছে। এই নির্জন শান্ত পরিবেশে, এরা প্রত্যেকে আমাদের সাথী হয়েছে। সারাদিন বিষণ্ণ বদনে থাকার পর অস্তাচলে যাবার পূর্বে গোমরা মুখো সূর্যদেবও হেসে উঠেছেন। আমাদের দুজনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে, যাযাবর কোকিল-কোকিলারাও যেন স্থায়ী ভাবে ঘর বাঁধার বাসনা উপভোগ করছে! জয়ন্ত, আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ। আমাকে নিয়ে তুমি আর উতলা হয়ো না। বলো লক্ষ্মীটি, তুমি আমার উপর কখনও আর অভিমান করবে না।

—কিভাবে যে তোমার ওপর এত অনুরক্ত হয়ে পড়লাম, তা আমি জানি না। তোমাকে একদণ্ড না দেখতে পেলে, আমার হৃদয় যেন মরুভূমির ন্যায় শুকিয়ে যায়। তুমি আমার সমস্ত অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে, আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও।

—শরীর স্থান অম্বরে। ধূলায় নয়। শশী যদি ধূলায় গড়াগড়ি

যায়, তবে তার শোভা কি পূর্ববৎ থাকে? তোমার স্থান আমার চরণে নয়। আমার হৃদয়-মন্দিরে। এস। তোমাকে আমার হৃদয়-মন্দিরে, ভালোবাসার রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করি। তুমিই আমার জীবনে, বাদল-কালের কদম্বফুল, শরতের শিউলি, বসন্তের পলাশ। গ্রীষ্মের রাঙা শিমুল। হেমন্তর শুভ্র প্রভাতে তুমি আর আমি যেন দূর্বা আর শিশিরের কণা। তুমি সদ্য প্রস্ফুটিত কমল, আমি মধুকর। তুমি সদ্যোজাত ভানুর আলোকছটা, আমি হিমালয়ের চূড়ার শুভ্র তুষার।

—আচ্ছা সুষমা, তুমি এমন কি চাও যা পেলে তুমি সর্বতোভাবে সুখী হবে? কি তোমার আশা?

—আমি কি চাই? তুমি কি বোঝ না, আমি কি চাই? আমি চাই তোমাকে। চিরদিন তুমি আমাকে ঠিক এমনি করে ভালবাসবে। সত্যি বলছি গো, এর মধ্যে কোনও মিথ্যা নেই। আমি চাই না সু-বৃহৎ অট্টালিকা। আমি চাই ছোট্ট একটি পর্ণকুটীর। আমি চাই না খেতে পোলাও ভাত, আমি চাই হেলে, সজনে, কাঁটানটের শাক দিয়ে মোটা চালের ভাত খেতে। আমি চাই না সিল্কের বেনারসী শাড়ী। আমি চাই মোটা সুতোর লাল পেড়ে শাড়ী, আর ঐ যে বললাম—চাই শুধু তোমাকে। যা পেলে আমি সব দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, মুখ বুজে সহ্য করতে পারি। আমি আর কি চাই জান? এস, কানে-কানে, চুপি-চুপি বলি, যেন কেউ শুনতে না পায়। আর তা হল—আমার হৃদয়ের অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে ডুবিয়ে রাখতে। যার ফসল হিসাবে আমরা পাব, একটি সন্তান। যে আমাদের, 'বাবা-মা' বলে অনাবিল আনন্দ দেবে। কি? যা চাইলাম দেবে তো?

খোকা···খোকা···এই। এই খোকা? ওঠ বাবা। দেখ তো কত বেলা হয়েছে। তুই যে বলেছিলি আট্‌টা বত্রিশের ট্রেনে কলকাতা যাবি। উঠে পড়।

—এই রে। আটটা···বেজে গেছে?

স্বাধীন বঙ্গভূমি দেবকুমার গুহ

বঙ্গমাতার ছিন্ন মূর্ত্তি রুধিরাপ্লুত শির
কিরণ তাহার রুদ্ধ করিছে তরঙ্গ বধে বীর
কাপুরুষ ওরা ওরা হানাদার দস্যু লুটেরা দুঃস্থ
এসেছিল কবে কৃপার ভিখারী বেইমান হবে নিঃস্ব।
এখনো সময় নাহি করো ক্ষয় মিলিত কণ্ঠে সবি
বঙ্গ মাতার রজত কিরীটে অতলে ডুবছে রবি
শের যে জাতি শির নাহি দেবে না দেবে তাহার গৌরব
দুষমনে বধ সমুখ সমরে পাঠাও তাহারে রৌরব।
ওরা মূঢ়মতি বেইমান ওরা বাচাল যে ওরা দীন
বঙ্গমাতার শির কাটি লবে কোন সে ভয়াল হীন;
এই যদি হয় তার পরিচয় করো করো তাকে ছিন্ন
মোরা শির দিব ভাই সার নাহি দিব আর না হবো যে ভিন্ন
গর্জন তুলি 'জয় বাংলা' মিলিত কণ্ঠে সবি
স্বাধীন ভারত! যুক্ত বাংলা! বিজয়ী বঙ্গভূমি।

প্রেমঘোরে প্রীতিঘোরে বিপ্লব রায়

আমার কোন প্রেমপ্রীতি নেই
অভিমানী মুঠো খুলে
শেষবেলা আকাশকে ভালোবেসেছি।
আমার পৃথিবীটা কখনো কখনো
শব্দের মধ্যে ডুবে থাকে
স্বপ্ন সাধ আশা নিয়ে সময়ে অস্থির স্বর্গে
প্রেম প্রীতির সাম্পানে ভেসে যাবো
গভীর বীথি ঘিরে বর্ণময় চিত্রকুটে
সংক্ষিপ্ত রাগিনীর সুরে গান গায় ময়না
এই মাধুকরীতে মাতে, নাগরদোলায় ঘোরে
প্রেম ঘোরে প্রীতি ঘেরে কাণাগলির অন্ধকারে।

বিশ্বদর্শন সিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

To see a world
In a grain of sand;
And heaven in a wild flower,
To hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.....

Robert Blake.

আক্ষরিক অনুবাদ—

একটি ক্ষুদ্র বালুকণায় যেন জগৎ বিধৃত
বনফুল ধরে রাখে স্বর্গের পবিত্রতা
অসীমের বিশাল ব্যাপ্তি মুঠিতে হবে ধরতে
অনন্ত মহাকাল সীমিত হবে এক দণ্ড মধ্যে।

ভাবানুবাদ—

একটি ক্ষুদ্র বালুকণার মধ্যে যেন জগৎ বিধৃত,
এই ধ্যান করতে হবে চির জাগরিত।
একটি দুটি ছোট ছোট জলবিন্দু,
তারি মাঝে বিরাজিত বিশাল সিন্ধু।
বনফুলের মাঝে দেখতে হবে স্বর্গের প্রতিচ্ছবি,
এই ভাবে হতে হবে ক্রান্তদর্শী কবি।
অসীমের বিশাল ব্যাপ্তি মুঠিতে ধরে,
মহাকাল পরিমিত হবে এক দণ্ড পরে।
অসীমকে সসীমে আনি হে বিধাতা মম,
আনন্দিত কর মোরে হে অন্তরতম॥

জীবন মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

জীবনটা কী যে দিনরাত ভাবি
পাই না ত কোনো কূল,
নাকি এ-জীবন আর কিছু নয়
কিছু সময়ের ভুল।

জীবন কী তবে অন্তবিহীন
কথা-কাহিনীর বই,
নাকি এ-জীবন শুধু যন্ত্রণা
হতবাক হয়ে রই।

জীবনের মানে খুঁজে-খুঁজে আমি
আজ বড়ো হয়রান,
জীবন কি তবে দো'তারার সুর
বাউলের কোনো গান।

জীবনটা কী-যে এর উত্তরে
হারিয়েছি সুধা সুখ,
এ-জীবন কী-যে তাই নিয়ে আজো
তোলপাড় করে বুক।

জীবন কি তবে ভোগ ও বিলাস
হাসি ও খুশির ঢল,
নাকি এ-জীবন দুঃখী জনের
দু'চোখের নোনা জল।

জীবনটা কী যে তাই নিয়ে আর
কবিতা হয় না লেখা,
জীবন কি তবে ক্রমশ প্যাচানো
একটি জটিল রেখা।

একটু তখন কাঁদবে হরিভক্ত

যখন রবনা বিশ্বমাঝারে আমি,
আমার কথা কি মনে মনে তুমি ভাববে ?
দুঃখ আজিকে যা কিছু দিতেছ তুমি,
সেকথা ভেবে কি একটু তখন কাঁদবে ?

আমি আনন্দ করে যে গান গেয়েছি আজি,
সে গান তোমার লাগেনি কিছুই ভালো,
যবে রহিব না তোমার কাছেতে আর,
সমাধি পরে কি তখন জ্বালাবে আলো ?

নিত্য দিনের টুকিটাকি সুখ দুখ,
আজ যাহা লয়ে গঞ্জনা দাও মোরে,
বিরহে তাহাই মনে মনে ভেবে হায়,
বিছানা তোমার ভিজাবে কি আঁখিলোরে ?

আজ বিরক্তিকর তোমার কাছেতে যাহা,
সহ্য করিতে পারনাকো তুমি তাই,
তখন সেটাই ভক্তির রূপ ধরে,
অনুশোচনায় মনে কিগো দেবে ঠাঁই ?

হয়তো তখন সে এক চাঁদিনী রাতে,
বাতায়ন খুলে উদাস চোখেতে হায়,
ভাবিবে আমার কথাকি একটি বারও,
দুফোঁটা অশ্রু ঝরিবে কি আঁখিছায় ?

মুক্তি শরৎ সাউ

শ্রী শরৎ সাউ উড়িষ্যাবাসী। ইনি একজন বৈজ্ঞানিক। কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা পরিষদ, কটক,—সংস্থায় কর্মরত। ইনি বংশপরম্পরাবিদ্। জেনেটিকস্ এঁর গবেষণার বিষয়।

হে সমুদ্র,
প্রলুব্ধ মু তুম বিশ্বমোহিনীরূপে—
লভিবাকু টিকিয়ে পরশ তরঙ্গ বাহুর
দেখিবাকু নীরজড় রাশি পরে
প্রতিচ্ছবি জীবনর প্রতি মুহূর্তর,
মেলাই দেলিমু নায়া
মাস মাস বর্ষ বর্ষ ধরি
কাঁহি কেতে দূরে রহিলেড়ি আত্মীয় স্বজন।
আজি কেবল চারিয়াড়ে তুমে
দ্বিগবড়য়রু মো যায়ে, মোধারু দিগন্ত সেপারি
পাদতরু আকাশ পর্যন্ত
মো বিতরে মো বাহরে
ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুরু পরিধি যারে,
চেতনার চারিপটে অবচেতনার ভিতরে
শোনিতর প্রতিকণা লবণাক্ত তুমর সিঞ্চনে।
চাহি নাহি ফেরুবাকু আউ,
সম্ভবীব নোহে তাহা এবে
তেঁড়ু হে সমুদ্র উজ্জীবিত কর তুম অন্তস্রোত
পাছাড়ঠু বড়ি ঢেউ সবু
পিট্টি হই চুরমার করি দেউ মোতে
খণ্ড খণ্ড হয়ে শরীর মিশি যাউ তুম মধ্যে—
জেপরি মুনখিলি কে বে তু মধু অলগা
বা নরহিবি ভবিষ্যতে কেবে।

বিসর্জন লতিকা দাশগুপ্ত

কাল রাতে দশমী সন্ধ্যায়
আনন্দে অশ্রুতে বিসর্জিত সে প্রতিমা।
রক্তারুণ বস্ত্র তাঁর সীমন্তে সিন্দুর,
অলঙ্কার-বিভা দেখ, সর্বশ্রীমণ্ডিত
অপরূপ দেবীমূর্তি। দশহাতে অস্ত্র সব
অশুভনাশিনী। সুতীক্ষ্ন চমকে
উচ্চকিত, ঝলকিত বিজয়ার রাত।
রাত্রির প্রহর শেষ, চন্দ্রমা মলিন
সেই মুখ ভেসে ওঠে জলে
সে যে কার? কে সে আমার?
দেবী আর নয় সে তো—এ কোন রমণী
সকল ঐশ্বর্য তার ভেসে গেছে, ধুয়ে গেছে স্রোতে।
অতসী ফুলের গুচ্ছ নীল হয়ে আছে।
পাষাণে রচিত গৃহ—নাই স্নেহমায়া
অনিবার খুঁজে ফিরে সুনিবিড় ছায়া
বুক ফাটা আর্তি নিয়ে ডুবে যায়—ভাসে তাঁর মুখ
যে জেনেছে সেই শেষ কথা
জুড়াবে সকল জ্বালা জল সুশীতল।

অন্ধকারের অনুভব বিউটি মজুমদার

রাতের আকাশ ছিল ঢাকা অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে ছিলাম তা-ও একা বহির্দ্বারে
যদি চাঁদ ওঠে!
শুধুই বালুর ঢেউ তবু অকারণ
অজানা পুলক তোলে মধু-শিহরণ
যদি ফুল ফোটে!

বাসনা উন্মুখ রয় তীব্র তিতিক্ষায়
অন্তরে আসন পাতা বহু প্রতীক্ষায়
যদি প্রেম আসে।

সহসা উঠিল ধ্বনি মৃদু সমীরণে
বাজিল অন্তরে বাণী সুধা গুঞ্জরণে—
আছি তব পাশে!

আশ্লেষে জড়াতে চায় বাহু দুইখানি
সুরভি ছড়ায়ে বায় করে কানাকানি
মধুছন্দ বেগে।

চকিতে কাটিল ঘোর চিত্ত চক্ষুষ্মান
অন্তরে রয়েছে মোর চির অনির্বাণ
প্রেমখানি জেগে।

চাঁদডুবি শুভা মুখোপাধ্যায়

সেদিন তখনও প্রেম আসেনি—
উজ্জ্বল চন্দ্রাতপে চোখের সাগর দিগন্তে
শুধু উত্তাল তরঙ্গের কলরোল,
ছুটে আসা বাতাসে ছড়ানো ঝরাপাতা
জড়ো করার চেষ্টা—
অ-নামী ফুলের গন্ধ, ভাল লাগার কষ্টে—
পাঁজরার খাঁচায় বন্দী হরতনের—
দাপা দাপি!
ছোট্ট মুঠিতে বন্ধ করা অনুভূতি
না জানা আগামীর দোলানি।
ফুরোন চাঁদনীর মৃদু আলোর রহস্যে

জেগে থাকা রাত সেদিন—
ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।
হঠাৎ তুফান ঝড়ে বিদেশী মেঘে
ছেয়েছিল আকাশের ছাদ
চাঁদডুবি হয়ে গেল বানভাসি বাদলে,
সেই থেকে প্রেম আর আসেনি।

সূর্যাস্তে সেই গান শংকর আচার্য

বৃষ্টি থামলে—জানালা খুলে যায় সেই!
তখন বিকেল।
ইলা—, দূরে আরো দূরে—
সন্ধ্যাকি আরো সাত মাইল?

সূর্যাস্তে সেই গান···যারা গায় প্রতিদিন!
ক্লান্ত ডানায় ওরা কী আজ ফিরবে না নীড়ে?
একে একে ভেঙেছি বয়স—
তোমারও তো বৈধ এখন।
ওই ঠোঁটে শিমুলের রঙ—উদারতা কই?
কাঁকনের শব্দে নির্লজ্জ দুচোখ!
তবুও কি বোঝনি তুমি?

ঘুমোতে পারিনি—
এমনি জেগেছিল গ্যালিলিও বুঝি?
পার্থিব পৃথিবীর চোরাটান!
বুকে আগুন জ্বেলে কি যে খোঁজে জোনাকি।

সবার উপরে স্বার্থ সত্য

নিতাইচন্দ্র দত্ত

হকারদের তুলে দাও, হুকুম হল জারী।
ভেঙ্গে দাও যত সব, দোকান সারি সারি ॥
কোথায় যাবে, কি করবে, আমরা তার কি জানি!
"ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও", এই আমাদের বাণী ॥
আপন স্বার্থে বসিয়েছিলাম, রাস্তার দুই ধারে।
বিদেশীরা দেখলে এসব, টাকা দেবে নারে ॥
বিশ্ব ব্যাঙ্ক দেবে টাকা, করতে "মেগাসিটি"।
তাইতো এখন হকারদের ধরে ধরে পিটি ॥
ভালোয় ভালোয় উঠলে ভালো, নয়তো হবে খুন।
সাহেবরা দেখবে না, আমাদের কি গুণ!
এরা বলে,—বসো তোমরা, ওরা বলে,—ওঠো।
যাঁর যেশী ক্ষমতা, সেই ফায়দা লোটো ॥
টাকাটা পেলে সব, নেবো সবাই মিলে।
তারপর যে পারে থাক্, দেশটাকে গিলে ॥
বিকল্প ব্যবস্থা, পায় না পুঁথি ঘেঁটে।
হকারদের তুলবেই লাথি মেরে পেটে ॥

একটা ছেলে

শোভন বিশ্বাস

একটা ছেলে লণ্ঠন জেলে
ইতিহাস পড়ে ভূগোল পড়ে
গদ্য পড়ে, কবিতা মুখস্থ করে
মুখস্থ হয় না।
পরীক্ষায় পাশ করার নিদারুণ চেষ্টা,
পাশ করে না।
একটা চাকরীর বড় প্রয়োজন
চাকরী অধরা চাঁদ।

অথর্ব জীবন সন্ধ্যায়
অথবা কাক ডাকা অলস মধ্যাহ্নে
মায়ের স্মৃতিচিহ্নে চোখ পড়ে
ভিজে চোখ সরিয়ে নিতে হয় গভীর দীর্ঘশ্বাসে।

আশ্রয় দেয় একবার, দুবার
কিংবা বারবার একচালা বাবার ভিটে।
আত্মীয় পরিজনের দয়ার দরাজ হাতে
করুণার যন্ত্রণা বড় বেশী।

খাবার জোটে; জীবন প্রাণের দিকে
একবার ও ফিরে তাকায় না।
শ্যাওলার মত সবুজের মাঝে
মিশে যেতে পারে না।
পারে না একটা ভালো ছেলের মত হাসতে।

মহানদের দান

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনাকাশ
কিংবা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
নজরুল বৈশাখী ঝোড়ো-বাতাস
আবার কখনো দক্ষিণা বা ফাগুনের
বিদ্যাসাগর আমাদের শিক্ষা—নির্ভীকতা
সকল করুণা—আদর্শ—নৈতিকতা
নেতাজী বিপ্লব ও স্বাধীনতার প্রতীক
সাধক-কবি আদিত্যকুমার মানব-সম্প্রীতির উদ্‌গাতা

শরৎ-সাহিত্য আমাদের অন্ন-বস্ত্র
বঙ্কিমচন্দ্র নৈন্দর্য ও অলংকার
শ্রীচৈতন্য আমাদের তৃষ্ণা
রাজা হরিশ্চন্দ্র ত্যাগ-সততা
শ্রীরামকৃষ্ণ—অরবিন্দ আমাদের প্রাণ
বিবেকানন্দ শৌর্য-বীর্য-যৌবন
মধুসূদন—দ্বিজেন্দ্র—অতুলপ্রসাদ—জীবনানন্দ
রজনীকান্ত—সজনী—সুকান্ত আমাদের আনন্দ
চণ্ডিদাস—রুইদাস—রামপ্রসাদ—লালন প্রভৃতি
আমাদের সকল যুক্তি ও ভক্তি

আরো নানান ঋষি-মনীষী-মহাপ্রভু-সাধু-সন্তমহান
ঐরূপে, আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে
আমাদের মানবজীবন সার্থক, করার জন্যে
দিয়েছেন তাঁদের চারিত্রিক গুণ বা দান।

শতবর্ষে নেতাজী প্রতিভা ভট্টাচার্য

শঙ্খ বাজারে-বাজারে শঙ্খ—নেতাজী জন্মক্ষণে—।
এতদিন তোরা ভুলেছিলি যাহা—আজ কি পড়েছে মনে ॥
বাজারে শঙ্খ—আরো জোরে বাজা—বাজা আরো জোরে বাজা ॥
যেইক্ষণটিতে—জন্ম নিলেন—তোদের দেশের রাজা ॥
ত্যাগের মন্ত্রে—নিজেকে সঁপিয়া—করিয়া দেশের কাজ।
বন্ধুর পথে—বহু দুঃখময়ে—রাজা হয়েছেন আজ ॥
যত নিচুমনা—ঘৃণ্য মানুষ—লেগেছিল তাঁর পিছে।
তারা কি উঠিতে পেরেছে স্বর্গে—থাকে নরকের ও নীচে ॥
মহামানবের—মহান কর্ম—মনে রেখে দিয়ো সবে।
ভারতের বুকে—নেতাজী সুভাষ আবার জন্ম লবে ॥

চিত্তরঞ্জন-দাস যে ছিলেন—মোর সুভাষের গুরু।
তাঁহার কাজের প্রেরণা লইয়া—সুভাষের কাজ শুরু ॥
সি-আর-দাস যে-আমার দেবতা—দেবতা বলিয়া মানি।
সবাই তাঁহারে ভুলিতে বসেছে—কি কারণে কি জানি ॥
তাঁহার ত্যাগ-ও তাঁহার কর্মের তুলনা নাহিক মেলে।
বিলাসিতা আর সুখ-সাধ সব—দুই হাতে ঠেলে ফেলে ॥
ঝাঁপিয়া পড়েছেন দেশের কার্য্যে—ফল ভোগ করি মোরা।
তোরা কি মনেতে রাখিতে পারিবি—মনে কি রাখিব তোরা ॥
তবে আয় আজ—মানিক জোড়ের—চরণে প্রণাম করি।
যুগ-যুগ ধরে চলি যেন মোরা—তাঁহাদের কথা স্মরি ॥

লিটল ম্যাগাজিন ও স্বউদ্যোগে প্রকাশিত বইয়ের যথাযথ প্রচার ও বিক্রয়ের একমাত্র দায়বদ্ধ অব্যবসায়িক উদ্যোগ—

রা ম ধ নু

মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২, এস. পি. সি. ব্লক, কাজিপাড়া, বাঘাযতীন, কলকাতা-৭০০০৯২

তিন কপি করে কত্রিকা ও বই পাঠানো যেতে পারে। বিক্রি হয়ে গেলে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়।

With best wishes :

D. K. SINGH

Transport Contractor

P158, Nazrul Islam Avenue
Calcutta-700054

বই ও পত্রপত্রিকা

শ্রীসুপ্রিয় বাগচী সম্পাদিত 'কবিতা' ডালগিস বাংলো, কলিকাতা-৪৭ দাম ১৫ টাকা।

সংকলন—চুয়াল্লিশ। কোন্ মাসে কোন বছরে ছাপা হয়েছে বুঝবার উপায় নেই। কবিতা লিখেছেনঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সমীর রায়চৌধুরী ইত্যাদি। সম্ভবত এটি ১৪০৩ এর পূজা সংখ্যা। পৃষ্ঠা সংখ্যাও দেওয়া নেই কিন্তু নানা ব্যতিক্রম সত্ত্বেও একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য সংকলন, বলতে কোনো বাধা নেই।

বিপ্লবতীর্থ। ১৪০৩ শারদ সংকলন। সম্পাদক—চম্পক দাশ। দাম ১০ টাকা। ১৪ মুরারি পুকুর রোড, কলিকাতা-৬৭।

বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছেন—অমিতাভ বাগচী, প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সুব্রত মুখার্জী ও সুতপা চৌধুরী। কবিতায় রাম বসু, মোহিনী-মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী, আশরাফুল হক, বিমলা মণ্ডল, শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়, শান্তি রায় ইত্যাদি। নগেন নিয়োগী ও সুখেন মণ্ডলের গল্প ভাল লেগেছে।

মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—সঙ্গ ও প্রসঙ্গ। সম্পাদনায়—পবিত্র অধিকারী ও সুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। মুক্তমন প্রকাশন ৭৪ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৩৪ প্রচ্ছদশিল্পী—অমল ভট্টাচার্য। দামের উল্লেখ নেই।

কবি মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের [মার্চ ১৯৪০—জানুয়ারি ১৯৯১] অকাল মৃত্যুতে তাঁর গুণমুগ্ধ সুহৃদ্‌গণ এই সংকলনটি প্রকাশ করেছেন। এটি একটি ভালবাসার ফসল। লিখেছেনঃ সরিৎশেখর মজুমদার, শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,

বিভাস দত্ত, অমলেন্দু দত্ত, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতরঞ্জন রায়, মলয় ঘোষ, প্রণবেশ কর, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ দে, জ্যোতি ঘোষ, দিলীপনারায়ণ দে, পবিত্র অধিকারী, পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, তাপস পাল, অমল ভট্টাচার্য। প্রয়াত কবি মানিকলালের বন্ধুত্ব, কর্মোদ্যোগ, অকৃপণ দাক্ষিণ্য, গোপন সাহায্য তাঁর বন্ধুরা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। এমন মহৎ হৃদয়বৃত্তি বর্তমান সমাজে নিতান্ত বিরল। তাই বন্ধুদের এই অর্ঘ্য। প্রকাশকগণ ধন্যবাদের পাত্র।

সংলাপ | কাব্যসংকলন | রণজিৎ মিত্র | ১৮০ কানুনগো পার্ক, কলিকাতা-৮৫ দাম পাঁচ টাকা | সমকাল | অরূপ পালের কাব্যসংকলন ঐ ঠিকানা থেকেই প্রকাশিত। দাম ৫ টাকা। দুটি গ্রন্থই আধুনিক কাব্যধারায় বিরচিত। অরূপ পালের চেয়ে রণজিৎ মিত্রই সাহিত্য-সেবী সমাজে বেশি পরিচিত কিন্তু দুজনের লেখাই আমাদের ভাল লেগেছে।

—কৃষ্ণস্বামী—

আদিত্যকুমার-স্মরণমঙ্গল

স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অগ্রনায়ক, বৈষ্ণব-আচার্য, সাধক-কবি শ্রীল আদিত্যকুমার গোস্বামী-প্রভুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ মেমোরিয়াল হল্'এ ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৬তে একটি মর্মগ্রাহী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শতবর্ষ উপলক্ষে 'আদিত্যকুমার-স্মরণমঙ্গল' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু। সভাপতি ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সাধক কবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন যে, এই উনবিংশ শতকের জাতকের কথা হয়তো অনেকেই জানেন না, কিন্তু ইনি আজীবন সত্যানুসরণ করে গেছেন। মনুষ্যত্বের ঔজ্জ্বল্যে তিনি সাধারণের

চেয়ে বড়ো ছিলেন কিন্তু সাধারণের মধ্যেই কাজ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, এই সব মহাপুরুষকে স্মরণ করলে আমাদের গৌরব বাড়বে, তাঁদের কোনও লাভ-লোকসান নেই।

প্রধান অতিথি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বর্তমানে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মাননীয় চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় স্মরণমঙ্গল গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, পবিত্র নিত্যানন্দ বংশের সন্তান আদিত্যকুমারের জীবনে দেশ-সেবা ও ভগবৎ ভক্তি ছিল অভিন্ন। আজকের সমাজ এই সব মানুষের কথা ভুলতে বসেছে বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন। নিজেদের মঙ্গলের জন্য আমরা তাঁদের জন্মতিথি পালন করবো। মাননীয় মুখোপাধ্যায়, আদিত্যকুমারের পুত্রদ্বয়কে এই বলে অভিবাদন জানিয়েছেন যে, তাঁরা অবশ্যই তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করলেন এই জন্মশতবার্ষিকী পালনের দ্বারা।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ পলাশ মিত্র, অধ্যাপক ফাদার শিলিংস্, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কবি আদিত্যকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সাধক-কবির কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে কবির শৈশবকালীন অবস্থা থেকে পূর্ণ জীবন পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষেপে অথচ তথ্য সহযোগে বিবৃত করেন। 'অসহযোগ আন্দোলনের' পরিপ্রেক্ষিতে কবির ছয় মাস কারাদণ্ডের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে এই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তিনি এমন কিছু গান রচনা করেছেন যেখানে বৃটিশ আমলের কারাগারের অমানুষিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। একদিকে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে ঘুরে নাম-গান প্রচার ও অন্যদিকে স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ—এই ধরণের বহুমুখী সাধনার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক।

ডঃ পলাশ মিত্র, সাধক-কবির জন্ম সালটি খুব উল্লেখযোগ্য বলে চিহ্নিত করেন। কারণ ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী স্বামী

বিবেকানন্দ পৃথিবী জয় করে ভারতের মাটিতে ফিরে আসেন, আর সেই মাটিতে একই বছর আদিত্যকুমার জন্ম নেন। এছাড়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও সঙ্গীতাচার্য দিলীপকুমার রায় একই বছরে জন্ম-গ্রহণ করেছেন বলে তিনি জানান। স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরে এসে এদেশের বহু সাধকদের কথা আলোচনা করেছেন, আর সেই বছরই জন্মালেন এই সাধক কবি। তাঁর মতো কবিকে ডঃ মিত্র 'নক্ষত্রের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। আদিত্যকুমারকে তিনি 'তুলসী মঞ্চের প্রদীপ' বলে সম্মানিত করেন।

'ভারতভূমি বিবেকানন্দের পুণ্য-দেবতা' বলে ভগিনী নিবেদিতা মন্তব্য রেখেছিলেন। ডঃ মিত্রের মতে একথা এই সাধক-কবির সম্পর্কেও বলা যায়। তিনি বলেছেন এই কবির বিদ্যার ঝাঁঝ ছিলো না, কিন্তু গভীরতা ছিলো, দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা ছিলো। আজ যে স্বাধীনতার মূল্য আমরা ভোগ করছি তার পেছনে এই সংগ্রামী কবির আত্মত্যাগ আছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

অধ্যাপক ফাদার শিলিংস্ সাধক-কবিকে 'রসিক-মানুষ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কবির প্রাঞ্জল রচনার উদাহরণ দিতে গিয়ে কবির লেখা একটি পদের উল্লেখ করেছেন। পদটি হ'ল—'মন হল না মনের মতো। মনের কথা বলবো কতো।'

কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ সাধক-কবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন। তা হ'ল—'সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে'। আজকের জন্ম-শতবার্ষিকী পালন উৎসবটিই তাঁর মতে প্রমাণ করে দিল যে তাঁকেও 'মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন'। বক্তা জানিয়েছেন যে, এঁরা তাঁদের কীর্তির দ্বারা মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন,—জীবন ছাড়িয়ে যে মহাজীবন আছে, তারই হদিশ্ দিয়েছেন এই কবি। এই চিরন্তন ভূমার প্রার্থনা, আমাদের মধ্যে তার প্রকাশ আছে—একথাই তাঁর মর্মবাণী।

কবি শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় অনেক তথ্য-বহুল মন্তব্য

রেখেছেন।

কবি কার্ত্তিক নাথ ধানবাদ থেকে এসেছেন। তিনি 'মুগবোড়য়া' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর স্বরচিত একটি নিবন্ধ পাঠ করেন।

বিউটি মজুমদার কবির বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে স্বাধীনতার ভাবধারাকেও সম্মান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর নিজের কথাগুলিই হ'ল কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি। মঞ্চের একধারে কবির প্রতিকৃতি ও অন্যধারে একটি তুলসী চারা সজ্জিত থাকায় বক্তা অভিভূত হয়েছেন। তুলসীর প্রয়োজনীয়তা ও পবিত্রতার সঙ্গে তিনি সাধক-কবিকে তুলনা করেছেন। সহজ কথা সহজভাবে বলা যে কত কঠিন—সেই কঠিন কাজই তাঁর মতে আদিত্যকুমার করে গেছেন। বক্তা, কবির জন্মস্থান বরিশাল জেলাকে এই বলে সম্মানিত করেছেন যে, এখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা অবস্থান করেছেন, অশ্বিনী দত্ত এখানে জন্মেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু এখানে নাম-গান প্রচার করেছেন। কবির ভাবধারাকে ধরে রাখার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বক্তা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

কবি রমেন্দ্রলাল রায় ও হেরম্বপ্রসাদ শর্মা সাধক-কবিকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁদের স্বরচিত কবিতা ও বক্তৃতার মাধ্যমে।

কবি বরুণ চক্রবর্তী, 'জেনারেশান গ্যাপ'-এর কথা বলেছেন। সাধক-কবিকে সম্মান জানিয়ে একালের আদর্শবোধের সমালোচনা করেছেন।

কবি পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে নানা ব্যক্তব্যের মধ্যে দিয়ে জানিয়েছেন যে আদিত্যকুমারের স্মরণ-মঙ্গল অনুষ্ঠান যথাযথ।

অনুষ্ঠান চলাকালীন অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় সাধক-কবির উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্য নিবেদন করেছেন।

অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় অর্ধে একটি মনোরম সুর-পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে তিনখানি রবীন্দ্রসংগীত পর পর পরিবেশন করেছেন শিশির দত্ত। এরপর মাল্যশ্রী গোস্বামী একখানি রবীন্দ্রসংগীত

গেয়ে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। তারপরে নজরুলগীতি গেয়েছেন শ্রীময়ী বিশ্বাস। তবলা সঙ্গত করেছেন জয়ন্ত সাহা, পার্কেশান-এ গুরুদাস চক্রবর্তী এবং এস্রাজ ও বাঁশিতে রমেন্দ্রলাল রায়।

আদিত্যকুমারের রচিত ও সুরারোপিত দুখানি সংগীত পরিবেশন করেন হাওড়ার বিশ্ববাজিৎ মণ্ডল, সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন বনমালী চক্রবর্তী।

কবির বিখ্যাত ছড়া কাহিনী 'ঝগড়া' পরিবেশিত হয় দ্বৈতকণ্ঠে। গদ্যাংশ পাঠে ছিলেন শিপ্রা সরকার ও আবৃত্তিতে সায়ন কর।

এরপর আদিত্যকুমারের পাঁচখানি গানকে আশ্রয় করে একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। এটি 'অর্ক সাংস্কৃতিক পরিষদের' পক্ষ থেকে সত্য বসু পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে দুটি নৃত্যানুষ্ঠান সমগ্র অনুষ্ঠানটির ভারসাম্য বজায় রেখেছে। একটি হল 'ব্রজের রাখাল' যা ছোট ছেলে-মেয়েদের সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবের প্রকাশক। নেপথ্যে রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন তনুশ্রী পোড়েল। নৃত্য পরিচালনা করেছেন চিত্রা ভট্টাচার্য। এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল 'রাসলীলা' শীর্ষক নৃত্যানুষ্ঠান। মণিপুরী নৃত্যের ভঙ্গীতে এই অনুষ্ঠানটি সকল দর্শককেই মুগ্ধ করে। এখানে মৃদঙ্গবাদক ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমর বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য পরিচালনা করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ইভা সিংহ।

সমস্ত অনুষ্ঠানটির প্রযোজনায় ছিলেন 'সাধক-কবি আদিত্য কুমার স্মৃতি সমিতি।'

রবিবারের চিরাচরিত ছুটির মাঝখানে এই দিব্যানুষ্ঠানটি সমস্ত দর্শক ও শ্রোতার মনকে যে কেবল আনন্দে উদ্বেলিত করেছে তা-ই নয়, এর সঙ্গে ইতিহাস-চেতনা ও কাল-চেতনার সমন্বয়ে সকলের অনুভূতিতে এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছে বলা যায়। 'তিন প্রজন্মের 'ধারক' হিসেবে এই প্রচেষ্টা অবশ্যই সানন্দ স্বীকৃতি পাবে।

সামগ্রিক তথ্য পরিবেশনায় শিখা গোস্বামী।

আরো মতামত

বাংলা ভাষার প্রতি 'অনুরাগ'-এর দরদ প্রশংসনীয়। রচনাগুলি চিত্তাকর্ষক। 'কুশীনগরে' ভ্রমণকাহিনী আকর্ষণীয় হয়েছে। 'সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস' প্রবন্ধটি তথ্যবহুল। পত্রিকাটির উন্নতি কামনা করি।

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, কলিকাতা-১২

'অনুরাগ' ১৪০৩ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংকলন পড়বার সুযোগ পেলাম। একাধিক ছোটগল্প, নিবন্ধ ও বেশ কয়েকটি কবিতা ও ছড়া সংকলনটির অঙ্গসজ্জা করেছে আকর্ষণীয় ভাবে। ডঃ পুষ্প সাকসেনার হিন্দী ছোটগল্প 'সিস্টার রোজী' বাংলা অনুবাদ করেছেন ধীরা ভট্টাচার্য অতি সাবলীলতার সঙ্গে। অনুবাদগন্ধী না হওয়ায় গল্পটি হয়ে উঠেছে 'ট্রান্সক্রিয়েশান' সৌন্দর্য বজায় রেখে। দীপালী চৌধুরীর 'কুশীনগর' রম্য ভ্রমণকাহিনী ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছে বুদ্ধদেবের জীবনাবসানের স্থান। রচনায় পাকা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট।

ছোট গল্পগুলির মধ্যে বীথিকা চন্দ্রের রচনাটিতে চমক আছে ঠিকই কিন্তু ঘটনা-সংস্থাপনা অতি নাটকীয়তায় আক্রান্ত। সুধা চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প নভেলেটের উপাদানে ভরা। 'শিক্ষক' গল্পটিতে রয়েছে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গরস।

শান্তনু খাটুয়ার কবিতা 'কালের ইতিহাস'-এ 'পরাজিতের শূন্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গোলপোস্টের মত' চিত্রকল্পটি সুপ্রযুক্ত। নির্মলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা 'নাগরী'তে ব্যবহৃত 'মানবিক সাহারা' বাক্যাংশটিতে আছে কাব্যিক ব্যঞ্জনা। এতে কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

সংকলনের প্রচ্ছদটির সহজ পরিপাট্য মনে পড়ে।

—সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-৬

● সাধক কবি আদিত্যকুমার ঃ জীবনী ও রচনা ॥

ভূমিকা ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু
গ্রন্থনা বিমলকুমার ভট্টাচার্য ২০·০০

● তত্ত্ব গ্রন্থমালা ॥ আদিত্যকুমার গোস্বামী বিরচিত

তত্ত্বমালিকা, সংপ্রসঙ্গ, তত্ত্বমাধুরী, তত্ত্বমঞ্জরী
একত্রে দশ টাকা।

● ছবি ছড়ায় মজার গল্প ॥ আদিত্যকুমার গোস্বামী বিরচি

গ্রামীণ সমাজচিত্রের কৌতুককর কাহিনী। ৮·০০

● মহাদাতা মহাপ্রভু ॥ শ্রীহরিহরানান্দ বিরচিত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও বৈষ্ণব দর্শনের
সহজ আলোচনা। ৮০·০০

● আদিত্যকুমার-স্মরণমঙ্গল ॥

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত।

এগারোটি প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় দর্শন বিষয়ে এবং কবি আদিত্য কুমার সম্পর্কে আলোচনা। আর আছে দুই বাংলার আড়াই শো কবির কবিতা। এতে কল্লোলযুগ-পরবর্তী বাংলা কাব্যের রূপরেখা বিধৃত। ৮০·০০

প্রাপ্তিস্থান

সর্বোদয় বুক স্টল। হাওড়া স্টেশন।
সাধক-কবি আদিত্যকুমার স্মৃতি সমিতি ১৩৫ হাজরা রোড, কলি-২৬

Edited and Pabiished by Dhira Bhattacharya M. A.
frcm 34/2, Mahim Haldar Str. Calcutta-700026